ভুলো
নীলা বনে
শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
বুক সোসাইটি

শ্রীসমরেশ বসু

বন্ধুবরেষু

এই লেখকের—

নিকষিত হেম

মুখোমুখি

জীবনযৌবন

সন্ধ্যাসকাল

তিমিরাভিসার

খাটের পাশে টিপয়ে জলের গেলাশ ঢাকা দিয়ে রাখে, শিয়রে টেবিলের ওপর কাচের কুজো। খাটের তলায় পা দিয়ে গামলাটা সামনে টেনে আনে। জানালার পরদা সরিয়ে দেয়। মশারি ঠিকমত গোঁজা হয়েছে কিনা পরখ করে। পরখ করে বেডসুইচটাও— জ্বালিয়ে, নিভিয়ে। তারপর রেগুলেটার ঘুরিয়ে আস্তে আস্তে পাখার স্পীড কমায়।

রোজকার মত প্রীতি তার কর্তব্য করে চলেছে।

বিছানায় চিৎ হয়ে চোখ বুজে থেকেও অবনী যেন স্পষ্ট দেখে: প্রীতি এখন ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, চারপাশে চেয়ে দেখে নিচ্ছে কোন কাজ বাকি থেকে গেল কি-না। এরপর মাথায় ঘোমটা তুলে দিয়ে দরজার দিকে এগোবে, সুইচ-বোর্ডে ডান হাত রেখে ঘাড় ফিরিয়ে খাটের দিকে তাকাবে, অবনীর চোখে চোখ রেখে বারেক মাথা হেলিয়ে হাসবে, একটি রাতের মত অবনীকে অন্ধকারে ডুবিয়ে দেবার আগে।

কিন্তু আজ কিনা প্রীতি ভেবেছে যে অবনী ঘুমিয়ে পড়েছে তাই হাসা-তাকানো মুলতুবি রেখে আলো নিভিয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে, বাইরে থেকে সাবধানে দরজার দুই পাট জুড়ে দেবে। আলো জ্বালিয়ে দালানটা একবার দেখে নেবে। বাথরুমেও উঁকি দিয়ে আসতে পারে। তারপর দালানের দরজায় তালা দিয়ে—

প্রীতিকে দালানের দরজায় তালা দিতে অবনী কখনো দেখেনি। কিন্তু জানে। কিছু দেখে, কিছু শুনে আর কিছু অনুমান করে নিয়ে যেমন অনেক কিছুই জানে।

জানে মানে, জানত। এতদিন জানত।

ঘরের দরজায় খিল না থাক, দালানের দরজায় তো তালা পড়বে?

অবনী ছটফটিয়ে ওঠে।

'ফ্যানের স্পীড কমালে কেন? বাড়িয়ে দিয়ে যাও।'

'ওমা! তুমি ঘুমোওনি?' প্রীতি অবাক।

অবাক অবনীও: প্রীতি তবে পাশেই দাঁড়িয়ে? একেবারে খাট ঘেঁষে? তবে কেন সে অত জোরে কথা বলে উঠল?

'আমি ভেবেছিলুম তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ।' প্রীতি উবু হয়ে মশারি গলিয়ে অবনীর কপালে হাত রাখে। 'দুষ্টু!' চুলগুলো বারেক মুঠো করে ধরে ছেড়ে দেয়।

অবনীকেও কি এখন খুনসুটি করতে হবে? হাতখানি বুকে চেপে চুড়ির আওয়াজ তুলে মামুলী সেই কথাগুলি বলতে হবে: হাজার ঘুমোলেও তোমার চুড়ির জলতরঙ্গ আমার ঘুম কেড়ে নেয়! তোমার দেহের সুবাসে আমার—! তাহলে 'আহাহা!' বলে সঙ্গে সঙ্গে প্রীতি খাটে বসে পড়বে। 'কবিরা এমন বানিয়েও বলতে পারে!' তার নাক টিপে দেবে, গালে আলতো করে চড় মারবে। দরকার হলে কাতুকুতু দিতেও ছাড়বে না।

দরকার হলে! 'আঃ, কি হচ্ছে! হাত সরাও, অসভ্য কোথাকার!' বলে বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ার দরকার হলে।

'কই?'

'আজ তো তেমন গরম নেই।'

'আমার লাগছে।'

'তাহলে বরং মশারির বাইরে কিছুক্ষণ মুখ বার করে—'

'না।'

'না! কিন্তু শেষ রাতে যখন ঠাণ্ডা পড়বে?'

'সে আমি বুঝব।'

'তুমি!'

প্রীতি হাসছে, কথার ঢঙেই অবনী টের পায়। হাসছে, অবনীর পক্ষে সুইচ-বোর্ডের নাগাল পাওয়া অসম্ভব বলে? 'কিন্তু সে আমি বুঝব!' মানে কি প্রয়োজন হলে আমি উঠে গিয়ে ফ্যানের স্পীড কমাব বা বন্ধ করে দেব? শেষ রাতের ঠাণ্ডায় আমার ঠাণ্ডা লাগলে লাগবে তোমার তাতে কি? 'সে আমি বুঝব'-র মানে তো এও হতে পারে?

নাকি প্রীতির হাসির মতলব অন্য?

কিন্তু প্রীতি কি জানে না যে এখন যতই গালে টোল খাওয়াক, ঠোঁটের তিলে জিভ ঠেকাক, চোখ দুটি ছোট করে আনুক, আড়ে আড়ে দরজার দিকে তাকাক—অন্ধকারে অবনীর কিছুই ঠাওর হবে না ?

'বললে শোন না কেন!' নিজের গলার স্বর নিজের কানেই অবনীর বেসুরো শোনায়। শোনাক, অবনী আজ বেপরোয়া।

'তোমার আজ কি হয়েছে বলো তো? খাওয়া নিয়ে তখন অনর্থক রাগারাগি করলে, সিগারেট আনাতে দু মিনিট দেরি হওয়ায়—'

'কিছু না।' অবনী যেন ধমক হাঁকায়।

'কিছু না!' শান্ত গলায় প্রীতি বলে, 'আজ বিশ বছর তোমায় দেখছি, কিন্তু কই, কোনদিন তো তুমি এমন—কী হয়েছে, বলো? নিশ্চয় কিছু হয়েছে। উঁহু, তুমি মাথা নাড়লেই শুনব। আমাকে বলো, লক্ষ্মিটি। আমাকেও বলবে না?'

প্রীতি এগিয়ে আসছে। এবার শুধু নাক টিপে দেওয়া নয়, গালে চড় মারা নয়—দুহাতে বুঝি গলা-ই জড়িয়ে ধরে।

তাড়াতাড়ি অবনী পাশ ফিরে শোয়।

'এ্যাই—আমার ওপর রাগ করেছ? সন্ধ্যেবেলা আসিনি বলে? কিন্তু জানো, আমি তিন-তিনবার এসে ফিরে গেছি? তোমাদের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হচ্ছিল, তাই ভাবলুম—'

কথা-কাটাকাটি? কথা-কাটাকাটিই বটে!

'হেমন্তবাবুর সঙ্গে কি তোমার আজ ঝগড়া হয়েছে?'

ঝগড়া? হেমন্তর সঙ্গে অবনীর ঝগড়া? হেমন্তর সঙ্গে অবনীর ঝগড়া করা সাজে? অবনীর অদ্বিতীয় বন্ধু যে-হেমন্ত?

'নিশ্চয় হয়েছে। আর তাই এখন—'

'ক্ষেপেছ!' অবনী গলাখাকাড়ি দেয়। 'বরং হেমন্ত যে আমার কত আপন এতদিনে বুঝলাম।' কেটে কেটে প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করে, যেন প্রীতির আড়ালেই হেমন্ত দাঁড়িয়ে, তাকে শোনাচ্ছে। 'আজ সন্ধ্যা পর্যন্তও আমি দুজনকে ভালোবাসতাম, এখন শুধু হেমন্তকেই ভালোবাসি।' আবেগের তোড়ে গলা অবনীর দস্তুরমত থরথর করে।

'যাক, এতদিন যে আরও-একজনকে ভালোবাসতে সেই তার সান্ত্বনা!' গলা থরথরায় প্রীতিও।

'ঠাট্টা নয়।'

'শোন কথা! ভালোবাসা নিয়ে ঠাট্টা!' বলে পা-য় পা-য় প্রীতি ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। বাইরে থেকে দরজা আবজে দেয়।

এরপর দালানের আলো জ্বালাবে, নেভাবে। বাথরুমেও উঁকি দিয়ে আসতে পারে। তারপর দালান পেরোবে। তারপর দালানের দরজা বন্ধ করে সেই বড়-ভারী তালাটা—

দরজায় তালা!

প্রীতি! প্রীতি! প্রীতিলতা!

নামটা অবনী মনে মনে শুধু উচ্চারণ করতেই চেয়েছিল, কে জানত মনটা এমন বিশ্বাসঘাতকতা করে বসবে।

ধড়ফড় করে প্রীতি এসে ফের ঘরে ঢোকে।

'আজ আবার কী পাগলামি শুরু হল!'

অন্যদিন হলে প্রীতির ওই গলা-কাঁপানো নালিশের ঢেউ বুকে এসে অবনীর আছড়ে পড়ত। তার চোটে অবনী উঠে বসত। মশারি সরিয়ে মুখ বার করত, দুই ঠোঁট সুঁচলো করে তুলে ধরত। প্রীতি চোখ পাকালে খাট থেকে হুমড়ি খেয়ে পড়ার ভয় দেখাত।

অন্যদিন হলে!

আজ অবনী মরমে মরে যায়: অভ্যাসের ফাঁদে এমনই জড়িয়ে পড়েছে? সত্য-মিথ্যার তোয়াক্কা রাখে না যে-অভ্যাস। বাস্তবের ধার ধারে না।

'যদি কেউ শুনতে পেত?'

শুনতে পেত! এই ঘর ওই দালান পেরিয়ে ও-মহলে যেত অবনীর গলার আওয়াজ? যায়? যায় যদি, কলিং বেলের ব্যবস্থা কেন? মাঝরাতে একদিন ডেকে ডেকে গলা চিরে ফেললেও ফল হয়নি বলেই না? অবনী অবিশ্যি কলিং বেলে আপত্তি করে বলেছিল, 'বাইরে যাবার জন্যে কিন্তু ডাকিনি। সেজন্যে গামলা ছিল, প্যান ছিল। ওটা অজুহাত। কিছুতেই ঘুম

আসছিল না বলে—।' 'জানি।' 'জানো? তবে নিশ্চয় এও জানো যে মুখ ফুটে ডাকা আর কলিং বেল বাজিয়ে ডাকায় তফাত কত? তবে কেন মিছিমিছি—' বাধা দিয়ে প্রীতি বলেছিল, *'তোমার কি কোনদিনই বয়েস* বাড়বে না। বোকাটা!'

বোকাটা! বোকামি! ন্যাকামি!

অবনীর 'প্রীতি! প্রীতি! প্রীতিলতা!' বলে হামলে ওঠা ন্যাকামি। প্রীতির 'যদি কেউ শুনতে পেত!' বলে খাটে এসে বসা ন্যাকামি।

অবনী সরে শোয়।

'বুঝেছি!'

বুঝেছে? বুঝেছে কি তার অস্তিত্ব এখন অকথ্য রকমের অসহ্য ঠেকছে বলেই অবনী সরে শুল?

'হেমন্তবাবুর গল্প শুনে তোমার মাথা বিগড়ে গেছে। না না করেও আমি কিন্তু কিছুটা শুনে ফেলেছি বাপু। তুমিও যেমন! ওই চালবাজের কথা বিশ্বাস করে বসে আছ।'

হেমন্তর কোন্ গল্পের কথা বলছে? একটা গল্প বলতেই হেমন্ত এসেছিল বটে, কিন্তু বলে গেছে দুটো গল্প। তার কোন্‌টাকে ও বিশ্বাস করতে মানা করছে?

'আর যদি সত্যিও হয়, তবে বলব মেয়েটির স্বভাব-চরিত্র ভালো নয়। হোক নামকরা গাইয়ে—'

'খারাপ?'

'ভালো! যে-মেয়ে অত সহজে—'

'কী অত সহজে?'

'কী অত সহজে! প্রেম করে বিয়ে করেছে, উপযুক্ত স্বামী আছে, একটি ছেলে আছে, সে কিনা—' প্রীতি অস্ফুট একটা ধিক্কারধ্বনি থুতুর মত ছিটিয়ে দেয়।

প্রীতি রেগে গেছে।

ঘটনাটা শুনে অবনীও রেগেছিল। প্রথমে অবিশ্বাস, পরে রাগ। অবিশ্বাস্য ঘটনা সত্য হলে মানুষের রাগ হয়। হওয়া আশ্চর্য না।

ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য বইকি। হেমন্ত শুধু নীহারের গল্প শুনিয়ে চলে গেলে অবনীই কি বিশ্বাস করত ?

মোটামুটি আলাপ-পরিচয় ছিল। এতদিন খবরের কাগজে আছে— সাহিত্যিক গায়ক শিল্পী নেতাদের সঙ্গে আলাপ থাকা স্বাভাবিক।

খবরের কাগজের লোক, স্বভাবতই মুখ-আলগা। বেফাঁস কথাবার্তাও হেমন্তর মুখে মানিয়ে যায়। তাছাড়া মেয়েদের ব্যাপারে হেমন্তটা বরাবরই একটু বেপরোয়া।

তাই বলে কোন ভদ্রমহিলাকে কী করে বলে বসে, 'বাসে বড্ড ভিড়, চলুন, রিকশায় যাওয়া যাক।' রাত দশটায় ? তায় ওই অবস্থায় ?

অথচ হেমন্ত নীহারকে বলেছিল।

শুধু তাই ? নীহারের মতামতের অপেক্ষা না করেই রিকশা ডেকে বসেছিল। ঝটপট নিজে উঠে পড়ে 'আসুন !' বলে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল।

আর নীহার কিনা 'দেরি হয়ে যাবে না? বলে মৃদু একটা আপত্তি তুলেই সুড়সুড় করে রিকশায় উঠল ? যে-নীহারের স্বামী মোটা মাইনের চাকরে কলকাতায় খানতিনেক বাড়ি ও একটা গাড়ির মালিক ! এবং দেখতে ডানাকাটা পরী না হলেও রবীন্দ্রসঙ্গীতের গায়িকা হিসেবে সবাই নাম জানে যে-নীহারের।

শুধু এই ? মিনিট দশেক যেতে-না-যেতে হেমন্ত ভালো করে বসার অজুহাতে বাঁ হাতখানা পিছনে রাখল, সইয়ে সইয়ে নীহারের কোমর পেঁচিয়ে ধরল, তারপর 'একটা কথা বলব, যদি কিছু মনে না করেন' বলে ভূমিকা ফেঁদেই প্রেম নিবেদন করে বসল ?

অবশ্য মেয়েদের ব্যাপারে হেমন্ত যেমন বেপরোয়া তেমনি ধৈর্যেরও তার বড় অভাব। এর ফলে ওর লাভ-লোকসান দুই-ই হয়েছে। আখেরে এতে নাকি লোকসানের পাল্লাই ঝুঁকে পড়ে: সহজে যা পায় সহজেই হারায়। সেজন্যে হেমন্তর হায়-আপসোস নেই। হেমন্ত বলে, জীবনে বাঁচতে হলে আপসোস কোরো না, আপসোসকে প্রশ্রয় দিও না।

'নীহারের ওপর তুমি বড্ড চটে গেছ, না ?' অবনী পাশ ফেরে।

প্রীতির গলায় হাত বুলায়। হারের পেণ্ডেণ্টটা উল্টে ছিল, ঠিক করে দেয়ঃ প্রীতির মনের কথাটা জানা দরকার। অতএব প্রীতিকে খানিক সোহাগ করা দরকার। প্রীতিকে সোহাগ করতে করতে অবনী শুধায়, 'তুমি হলে কী করতে?'

'আমি? ঠাস করে এক চড় মারতুম। জুতোপেটা করতুম। চেঁচামেচি করে—'

'লোক জড়ো করতে?' প্রীতির দাবনায় অবনী হাত রাখে। নরম মাংসের তালে কবজি পর্যন্ত ডোবাবার চেষ্টা করে। 'তারপর? কেলেঙ্কারি হত? তোমাকে জোর করে ও রিকশায় তুলেছে বললে কেউ বিশ্বাস করত না। কেননা তুমি কচি খুকি নও। সবাই ধরে নিত—রিকশায় তোমরা বাড়াবাড়ি শুরু করেছিলে, ধরা পড়ে যাওয়ায় এখন হেমন্তর ওপর দোষ চাপিয়ে সাধু সাজছ। কিম্বা ধরলাম, হেমন্তকেই সবাই দোষী ভাবল, কিন্তু তোমার নামেও, মিথ্যে হলেও, দুর্ণাম রটত। সবাই এ নিয়ে আলোচনা করত—করত তো?'

জেরার মুখে প্রীতি থতমত খায়। একটু চুপ করে থেকে বলে, 'প্রথমেই আমি আপত্তি করতাম—যার-তার সঙ্গে রিকশায় যেতে রাজীই হতাম না।'

'উঁহু, রিকশায় তো তুমি আগেই উঠেছ, এখন রাজী হতাম না বললে চলবে কেন?' ঘাড় ধরে মুখটা নামিয়ে এনে প্রীতিকে চুমো খেয়ে অবনী জানতে চায়, 'ওর প্রেম-নিবেদনে তুমি কী করতে তাই বলো?'

'আর যাই করি ওকে উসকে দিতাম না।'

'মানে?'

'হেমন্তবাবু যখন জিজ্ঞেস করলেন—রাগ করলেন, তখন ন্যাটুকে সুরে বলতাম না—'রাগ করব কেন, হেমন্তবাবু। এ-ব্যাপারে রাগ করে নাটক করা সিনেমা-থিয়েটারে সাজে। আমি আর্টিস্ট, আর কিছু না হোক মানুষের মন বুঝি, হৃদয় বুঝি। আমি জানি, কারো ভালোবাসা পাওয়া পরম সৌভাগ্যের কথা। আপনি আমায় ভালোবাসেন, মুখ ফুটে বললেন—জেনে আমার বরং গর্ব হচ্ছে।'

নীহারের কথার পুনরুক্তি করেছিল হেমন্ত, ঠাট্টার সুরেই করেছিল,

পুনরুক্তি করছে প্রীতিও, এও ঠাট্টার সুরেই—কিন্তু অবনীর মনে হয়, প্রীতি যেন আচমকা নীহার হয়ে গেছে।

প্রীতির কোমর জড়িয়ে থেকে সে যেমন বনে গেছে হেমন্ত?

এমন চমৎকার নকল প্রীতি করতে পারে! নকল মানে অভিনয়? অবনী তাজ্জব।

'রিকশায় চুপচাপ থাকতাম, তারপর বাড়ি পৌঁছে ওকে কুকুরের মত দূর করে দিতাম। আদর করে ঘরে নিয়ে এসে কফি খাইয়ে গান শোনাতে বসতাম না।'

'তাহলে তুমি বলতে চাও নীহারই খারাপ?'

'খারাপ! ছেনাল কাকে বলে জানো? ও তাই। ওর প্রশ্রয় না থাকলে হেমন্তবাবুর সাহস কী যে—'

'প্রেমকে তুমি মানো না।'

'প্রেম!' প্রীতি হিসিয়ে ওঠে। 'ঘরে যার স্বামী—'

'তার মানে তুমি বলতে চাও যে-মেয়ের স্বামী আছে ছেলে আছে সংসার আছে তার পক্ষে—' অবনী কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে বসে। প্রীতিকে কাছে টানে।

'এ্যাই!'

বগলের তলায় দুই হাত দিয়ে প্রীতিকে অবনী জড়িয়ে ধরে।

'না না—বিশ্বাস কর—আমার শরীর আজ—'

প্রীতির ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরে তার মুখ অবনী বন্ধ করে দেয়। প্রীতির চোখে চুমো খায়। কপালে খায়। সিঁথিতে খায়।

সবশেষে প্রীতির গালে গাল রেখে তার কানে কানে অবনী ফিশ ফিশ করে বলে, 'তাহলে প্রীতিলতা, যে-স্ত্রীলোক চারটি ছেলেমেয়ে, উঁহু তিনটি মেয়ের মা, যার অগ্নিসাক্ষী স্বামী বর্তমান, সে যখন—'

'ঠাকুরপো!'

রিকশায় কী পরিমাণ নাটক নীহার করেছিল, অবনী ভাখেনি। হেমন্তর কথা শুনে মোটামুটি একটা কল্পনা করেছিল বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই কল্পনাটা তালগোল পাকিয়ে যায় হেমন্তর কথা শুনেই।

প্রীতির নাটকীয় প্রস্থানটা কিন্তু প্রাণভরে ছাখে: এক ধাক্কায় তাকে ঠেলে ফেলে তড়াক করে উঠে দাঁড়াল, চিৎকার করে কী বলতে গিয়েই সামলে নিয়ে ছিটকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এত বছরের নিয়মিত রুটীনের আজ খেলাপ হল। দরজা-আবজানো, আলো-জ্বালিয়ে-দালান-দেখা, বাথরুমে-উঁকি-দেওয়া, দালানের-দরজায় তালা—সব বরবাদ।

কেন? আজ আর চোরের ভয় নেই? মনটা অবনীর আচমকা সেয়ানা হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আধখানা পা ঢুটিও তার আস্ত হয়ে গজিয়ে উঠেছে? ঘরে চোর ঢুকেছে টের পেলেও চোরকে দেখে বেকুবের বেহদ্দ বনে গিয়ে চুপচাপ বিছানায় পড়ে থাকবে না, চোরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে?

প্রীতি কি টের পেয়ে গেছে, কাটা পা গজানো অসম্ভব হলেও খসে পড়েছে অবনীর চোখের ঠুলি? চোরকে সে আজ অনায়াসে দাদা বলে চিনতে পারবে?

দাদা, নিজের মায়ের পেটের বড় ভাই!

ইশকুলের ড্রয়িং স্যার অবনীর স্লেটে একটা গোলাপ ফুল এঁকে দিয়েছিলেন। রঙিন চকখড়ি দিয়ে আঁকা ছবি।

তাদের বাগানে কত জাতের গোলাপ ফোটে, সবাই সেই গোলাপের তারিফ করে, কিন্তু স্লেটের ছবির মত সুন্দর গোলাপ বাগানেও নেই।

গোলাপ বাগানটা দিদি ভালোবাসত। বাগানের প্রতিটি ফুল দিদির প্রিয় ছিল। দিদি কাউকে ফুল ছিঁড়তে দেওয়া দূরে থাক, ছুঁতে পর্যন্ত দিত না। অথচ বাড়িতে কেউ এলেই গোলাপ বাগানটা তাকে একবার দেখানো চাই।

সকলে তার গোলাপ দেখে মুগ্ধ হোক, সেজন্যে তাকে ঈর্ষা করুক—দিদি চাইত।

অবনীও চেয়েছিল তার স্লেটের গোলাপ দেখে সবাই মুগ্ধ হোক, সেজন্যে তাকে ঈর্ষা করুক।

কিন্তু স্লেটের ছবি দেখে দিদি নাক সিটকায়। তাই অবনী আর কাউকে সে-ছবি দেখায়নি। সাবধানে স্লেটটা লুকিয়ে রেখেছিল। সময় পেলেই একা-একা ছবিটা দেখত। দিদি যেমন দুহাত পিছনে রেখে গাছে ঝুঁকে পড়ে ফুলের গন্ধ নেয়, অবনীও তেমনি টেবিলে স্লেট রেখে উপুড় হয়ে পড়ে তার ছবির ফুলের গন্ধ শোঁকে।

এবং, লোকে শুনলে যদিও বিশ্বাস করবে না, অবিকল গোলাপের গন্ধই সে স্লেটের ছবিতে পেত। নইলে ছবির কাছে নাক নিয়ে গেলেই বুকটা তার অমন শিরশির করে উঠবে কেন?

কিন্তু বড় সাধের সেই স্লেটের ছবিটিকে কি সে চিরতরে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিল?

দিদি যেদিন রাখালদার কোটে ফুল গুঁজে দিল আর রাখালদা সেই ফুলটাই দিদির খোঁপায় পরিয়ে দিল আর হঠাৎ অবনীকে দেখতে পেয়েই দিদি তাড়াতাড়ি ফুলটা খোঁপা থেকে খুলে ব্লাউজের মধ্যে গুঁজে ফেলল—সেদিন সে তাড়াহুড়ি নিজের ঘরে গিয়ে ঢোকে, ড্রয়ার থেকে স্লেটটা বের করে বুকে চেপে ধরে। ফুল দেওয়া-নেওয়ার দৃশ্য দেখে কী উত্তেজনাই যে জেগেছিল!

গায়ের ঘামে বুকের ঘষায় মুছে গিয়েছিল সেই স্লেটের ছবি।

অঝোরে কেঁদেছিল অবনী। সাত বছরের অবোধ অবনী।

তার দুঃখ কেউ বোঝেনি। মা না বাবা না, দাদা দিদি কেউ না। বরং দিদি হেসেছিল। দাদা ঠাট্টা করেছিল। মা অবিশ্যি ড্রয়িং স্যারকে দিয়েই স্লেটের দুপিঠ ভরে গোলাপের ছবি আঁকিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, রাখালদা বিলিতি ছবির বই পর্যন্ত কিনে এনেছিল।

অবনীর মন মানেনি: যাই করো, মুছে-যাওয়া সেই ছবিটি কি ফের ফিরে আসবে? নিজেই সে তার সাধের ছবিটি মুছে ফেলেছে—এই দুঃখ জীবনেও যাবে?

বড় হয়ে অবনী তার সাত বছরের শোকের জন্যে হেসেছে: স্লেটের ছবি মুছে যায়, যাবেই। তার জন্যে কেউ শোক করে?

সুতরাং অবনী আজও হাসতে পারে। জীবনের স্লেটে গত কুড়ি বছর ধরে সে যত ছবি এঁকেছে, হেমন্ত আজ মুছে দিয়ে গেল। হরিহরআত্মা বন্ধু যে-হেমন্ত। যে-হেমন্তকে এতকাল সে নিজেরই চলমান প্রতিনিধি হিসেবে ভেবে এসেছে।

জীবনের স্লেটে! কী একখানা উপমা!

হবে না! অবনী যে কবি! নির্ভেজাল কবি। কবি এবং জীবন-শিল্পী!

অবনী হাসে। অন্ধকারকে দাঁত দেখায়।

প্রথম চোটেই কীভাবে প্রীতিকে নাজেহাল করল ভেবে বুকটা অবনীর পুলকে থই থই করে।

হেমন্তর কথাগুলি যে অক্ষরে অক্ষরে সত্যি প্রীতির ওই নাটুকেপনার পরে আর সন্দেহ কি!

'প্রেম, বুঝলি, প্রেম করা, প্রেমের কথা বলা, প্রেমের কবিতা লেখা, এমন-কি প্রেমের কথা ভাবাও আজ দুরকম অবস্থায় সম্ভব। এক আমার মত। আমার অবস্থা তখন রীতিমত কাহিল। এসব ক্ষেত্রে মানুষের মনে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় বিবেকের—চালচলনটা উচিত হচ্ছে কি হচ্ছে না? কিন্তু আমার মনে দ্বন্দ্ব চলছিল সংশয়ের—আমি কি বেহেড হয়েছি, না হইনি? মাঝে মাঝে কথা জড়িয়ে যাচ্ছে—এ কি প্রেমাবেগে, না মাতাল বলে? যা বলছি তা কি মাতালের প্রলাপ, না আমার মনের কথা? মনেরই কথা। ওর গানে আমি মুগ্ধ, ওকেও আমার ভালো লাগে। ভালো লাগা থেকেই তো ভালোবাসা? তুই কনকের কথা তুলতে পারিস। কিন্তু একসঙ্গে কি মানুষ দুজনকে ভালোবাসতে পারে না? একের মধ্যে যা নেই অপরের মধ্যে যদি তা পায়? তুই অন্তত ব্যাপারটা বুঝবি।'

হেমন্ত আজ বুঝল, অবনী অনেক আগেই বুঝেছে। দুজন কেন, মানুষ এক সঙ্গে অনেককে ভালোবাসতে পারে। যদি তার সে-যোগ্যতা থাকে, সাহস থাকে। অপরিমেয় প্রেম বহনের যোগ্যতা, সংস্কারকে অস্বীকার করার সাহস। ভালোবাসা যদি সঞ্জীবনী সুধা হয়—

'আমাকে আগে শেষ করতে দে, তোর ভাষ্য পরে শুনব। প্রথমে সন্দেহ হল, আমি মাতাল ও টের পেয়েছে— দেশী খেলে সর্বাঙ্গ

দিয়ে যখন খোশবু ছোটে—টের পেয়েছে বলেই রিকশায় চুপচাপ আছে, অগত্যা প্রশ্রয় দিচ্ছে, পরে, সুযোগমত শোধ তুলবে। তাই যেচে আমি গান শোনার জন্যে বাসায় যেতে চাইলাম: স্বামী নেই, দেখি এ-অবস্থায় আমায় নিয়ে যায় কি-না, গেলে, কী করে। ব্যাপারটা অবিশ্যি খুব রিস্‌কি হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমারও তখন রোখ্ চেপে গেছে—আমি মাতাল হয়েছি না প্রেমিক বনেছি হাতে-নাতে সেটা যাচাই করে নিতেই হবে। আমার প্রস্তাবে ও রাজী হয়ে গেল, দর বাড়াবার জন্যে আমি 'আজ না হয় থাক, রাত হয়ে গেছে।' বলে আপত্তি জানাতে 'তাতে কি! আপনি শুনতে চাইলেন। চলুন।' বলে সাধাসাধি করল। বাড়ির সামনে গিয়ে এক রকম প্রায় হাত ধরে রিকশা থেকে নামাল, পথ দেখিয়ে দেখিয়ে ওপরে নিয়ে গেল। তারপর, 'বসুন, এক্ষুনি আসছি' বলে মৃদু হেসে ভিতরে চলে যেতে ভাবলাম, এবার উঠে পড়ি। আর থাকার কী দরকার। আমার যা যাচাই করার সে তো হয়ে গেছে: এখন কি আঁর শুধু গানে মন ভরবে। প্রথম দিনেই বেশি দূর এগনো ঠিক নয়।

'আজ আমি খুব ক্লান্ত,' মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই শাড়ি বদলে বেণী দুলিয়ে মুখে এক পোঁচ পাউডার বুলিয়ে ফিরে এল, 'আজ আমার স্কুলের ফাংশান ছিল, সারাটা দিন খাটাখাটনি গেছে, গান কেমন হবে জানি না—'

'তাছাড়া রাতও হয়ে গেছে—'

'সে কিছু না। তেমন শ্রোতা পেলে আমি সারারাত গাইতে পারি। জানেন, চিনুদার সঙ্গে বাজী রেখে সেদিন বাইশটা গান একটানা গেয়েছি। অবিশ্যি বাজী জেতার ফলে শেষ পর্যন্ত আমার ক্ষতিই হয়েছিল—সাত দিন গান গাওয়া বন্ধ।'

'তা একটানা অতক্ষণ গাইলে—'

'গান গেয়ে নয়, আইসক্রীম খেয়ে। বাজীতে হেরে গিয়ে চিনুদা ক্যাপ্রি-তে আমাদের বাহাত্তর টাকার আইসক্রীম খাওয়ালেন। আমাকেও খেতে হল। না খেলে আবার বাজীতে হারতে হয়।'

বাহাত্তর টাকার আইসক্রীম! আমি ঢোক গিললাম।

'কিন্তু আমি কি তেমন শ্রোতা—'

'নয়!'

ও চোখে চোখে তাকাল।

আমি নড়ে-চড়ে বসলাম।

'রবীন্দ্রসঙ্গীতের আমি অন্ধ ভক্ত, সুরের সামান্য এদিক-ওদিক হলে ধরতে পারি—অথচ সুর লয় তাল সম্পর্কে আমার কোন আইডিয়া নেই। রাগের সংখ্যা কত, রাগরাগিণীর মধ্যে কী তফাত—আমি জানি না। আমার তো মনে হয়—'

ও শব্দ করে হাসল।

আমি অপ্রস্তুত: আমার কথাগুলো কি লেকচারের মত হয়ে যাচ্ছিল? কিন্তু কথাগুলি আমার প্রাণের কথা। আমার মত মানুষ, রবীন্দ্রনাথকে যে এযুগে অচল-অপাঠ্য মনে করে, কী করে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ভক্ত হয়? অন্ধ ভক্ত? রবীন্দ্রনাথের যে-কবিতা পড়লে বমির মত হাসি উথলে আসে, সেই কবিতাই গান হয়ে ঝরলে তার হৃদয়ে কেন দোলা লাগে।

আসলে আমার কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীতও এক রকমের মদ। আমি মদ খাই। কেন? ফুর্তির জন্যে নয়, নেশা হবে বলে। নেশা করা মানে? যা-খুশি ভাবব, যা-খুশি বলব, যা-খুশি করব। সুস্থ অবস্থায় তো সেটা সম্ভব নয়। তখন অনেক ভেবেচিন্তে কথা বলতে হয়, বহু বিচার-বিবেচনা করে চলতে হয়।

ভেবেচিন্তে কথা বলা আর বিচার-বিবেচনা করে চলা মানেই ভণ্ডামি করা। হ্যাঁ, ভণ্ডামি। ভণ্ডামিই। কেননা যাকে লাথি মারতে চাই তখন তাকে সেলাম ঠুকতে হয়, প্রাণপণে যাকে ঘৃণা করি তার সাথে গলাগলি হতে হয়। সারাদিনের এই ভণ্ডামির প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যে সন্ধ্যেয় আমি মদ খাই—মাতাল হই।

সেদিন দুবার মাতাল হলাম।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের মদে নতুন করে নেশা জাগল। এ নেশা-আগের চেয়েও

তীব্র, জোরালো। কিন্তু এ-নেশায় চেতনা ভোঁতা হয়ে আসে না, আরও তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। কল্পনার সাথে মিতালি পাতিয়ে স্বপ্নের অভিসারে পা বাড়ায়। অতীতকে বর্তমানে টেনে আনে, বর্তমানকে ভবিষ্যতে ঠেলে দেয়, নিজেকে একটি স্বতন্ত্র জগতের সম্রাট বলে মনে হয়। তখন গানে গানে সব বন্ধন টুটে যায়, রুদ্ধ বাণীর অন্ধকারে কাঁদন জেগে ওঠে, বর্ণে বর্ণে পুষ্পে পর্ণে বনে বনে দিকে দিকে বসন্তবায় গীতলেখা লিখে যায়, গানের ভিতর দিয়ে ভুবনখানি যখন দেখি তখন তার আলোর ভাষায় আকাশ ভালোবাসায় ভরে যায় আর কেবলি মনে হয়—এ পথে আমি যে গেছি বারবার ভুলিনি তো একদিনও।

দেখলাম, গঙ্গার ধারে আমি বসে আছি, আমার কোলে ও মাথা রেখে শুয়ে—এমনি করেই যায় যদি দিন যাক না। মনে হল আমার জরজর ভাব হয়েছে, চোখ বুজে পড়ে আছি, ও শিয়রে বসে, আমার কপালে একখানা হাত—স্মৃতির অতল্ থেকে সুর উঠে আসছে তোমায় গান শোনাব, ওগো ঘুম-ভাঙানিয়া। দেখলাম, শহরতলীর পথে যেতে যেতে দুজনে হঠাৎ নেমে পড়লাম, দুপাশে দিগন্তবিস্তার সবুজের সমারোহ—কথাগুলি খুবই ছেলেমানুষি শোনাচ্ছে, না? না? তা তুই কবি, তোর কবিত্ব জাগতে পারে—আমার কিন্তু বলতেই হাসি পাচ্ছে। আজ, এখন পাচ্ছে—কাল পায়নি। কেননা আমার বয়েস যে তখন কুড়ি বছর কমে গিয়েছিল। নবীন যুবা হিসেবে সেদিন প্রেমে পড়লে প্রেমিকাকে নিয়ে যা যা করব বলে কল্পনা করতাম—'

'প্রেমের কি বয়েস আছে রে।'

'কাল আমারও তাই মনে হয়েছিল। নেশার ঘোরে ভেবেছিলাম বয়েস চল্লিশ পেরোলেও মনটা এখনও কুড়িতেই রয়ে গেছে। নইলে এমন সব কল্পনা করতে পারছি কী করে? এবং এই কুড়ি বছর মানে আজকের কুড়ি বছর নয়—কুড়ি বছর আগেকার কুড়ি বছর। আজকের কুড়ির নমুনা তো হরবখত দেখছি। কুড়ি বছরেরই নবীন এক যুবা আমার পাশের ঘরে থাকে, সুধীর। সকালে টিউশানি, দুপুরে অফিস, সন্ধ্যায় বি-কম। ওর যৌবনের একমাত্র স্বপ্নসাধ খেয়ে পরে বেঁচে থাকার পাকাপাকি ব্যবস্থাটা কী করে

করবে। আমাদের সময়কার একটি কুড়ি বছরের ছেলের সঙ্গে আজকের কুড়ি বছরের ছেলের আকাশ-পাতাল তফাত। যাক, তুই যখন প্রতিবাদ করছিস ও কথা থাক। নিজের কথাই কবুল করি। নিজেকে কাল রাতে আমার আস্ত একটি নবযুবক বলে মালুম হয়েছিল। আস্ত এবং আদর্শ। মনে হয়েছিল—নিজেকে যে আমি প্রৌঢ় বলে জাহির করি, ফ্রাসট্রেশনের স্রোতে গা ভাসিয়ে চলি—সেটা মিথ্যে। আসলে আমি জীবনবিদ্বেষী নই, জীবনের কাঙাল। এই বিদ্বেষের মূলে আছে বঞ্চনা। বঞ্চিত হয়েছি বলেই বঞ্চনাকে সার বলে জেনেছি। জীবনের হাতে বারবার মার খেয়ে অভিমান করে জীবনের থেকেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি। অভিমান করে মানুষ কার ওপর? না যাকে ভালোবাসে। জীবনকে আমি ভালবাসি। জীবনের কাছে বড় বেশি প্রত্যাশা করেছিলাম—তাই আমার এই ট্রাজেডি। সে-ভুল এবার সংশোধন করব। আমিও বাঁচতে চাই। সুস্থ সুন্দর স্বাভাবিকভাবে—

রাতে শুয়ে ঠিক করলাম, কাল সকালেই ওর বাসায় যাব, আমার সব কথা ওকে বলব, ওর ভালবাসা ভিক্ষে চাইব। বলব, নীহার, তোমার অনেক আছে, তার সবটুকু গ্রহণের ক্ষমতা তোমার স্বামীর নেই। যেমন তোমার গান। গানের জন্যেই শোভন চৌধুরী নাকি তোমায় ভালোবেসে বিয়ে করেছে—কিন্তু গান, বিশেষ করে রবীন্দ্রসঙ্গীত কি সত্যই ও ভালোবাসে? শোভনদের মত মানুষ, জাঁদরেল অফিসার, কেতাদুরস্ত দিশি সাহেব, অফিস-ক্লাব-পার্টিই যাদের জীবনের ধ্যানজ্ঞান রবীন্দ্রসঙ্গীতকে তারা ভালোবাসতে পারে? কী লাভ ওদের রবীন্দ্রসঙ্গীতকে ভালোবেসে? তাতে কি চাকরিতে লিফট মিলবে, ফরেন টুরের সুযোগ আসবে? শ্রীনিকেতনী পরদায় ঘর সাজিয়ে ওরা রবীন্দ্রপ্রীতির পরাকাষ্ঠা দেখায়। দু লাইন যারা শুদ্ধ বাংলা লিখতে পারে না—গুরুদেব গুরুদেব করে তারা গলা চেরে। আর পাঁচটা শান্তিনিকেতনী শাবকের মত রবীন্দ্রনাথকে ওরা কুলগুরুর আসনে বসিয়ে নিজেদের দর বাড়ায়। গানকে ভালোবাসার অজুহাতে নামকরা এক সুন্দরী গায়িকাকে বউ করতে পেরেছে—এই অহমিকাতেই ওরা ডগমগ। ফরেন সার্ভিসে যেমন সুন্দরী বউয়ের স্বামীর কদর—শোভনদের সমাজে তেমনি রবীন্দ্রসঙ্গীতের গায়িকার স্বামীর। বাজী রেখে বাহাত্তর টাকার আইসক্রীম খাওয়ার সমাজে!

বলব, নীহার, কাল তুমি যখন গাইছিলে 'আর রেখনা আঁধারে, আমায় দেখতে দাও—'আমার বুকে কেবলি মোচড় দিচ্ছিল, আমার দুই চোখ ফেটে পড়তে চাইছিল। মনে হচ্ছিল, এ যেন আমারই মনের প্রাণের কথা। আমার এবং তোমার। তুমিও একদিক দিয়ে বঞ্চিত, নীহার। ওই সমাজে জন্ম হলেও, ওই সমাজে মানুষ হলেও—তুমি আর্টিস্ট। তাই অত প্রাচুর্যের মধ্যে থেকেও তুমি নিঃসঙ্গ। শোভন চৌধুরীর স্ত্রী হয়েও কেন তুমি একটা গানের ইশকুলের জন্যে এত পরিশ্রম কর, গায়কদের সঙ্গে অত অন্তরঙ্গ ভাবে মেশ—আমি কি বুঝি না। তুমিও দুটি জীবন বহন করে-চলেছ। এ নিয়ে পাঁচজনে পাঁচ কথা বলে, আমার কানে এসেছে কিন্তু—'

'আজ সকালে কী হল বল? তোর কথা শুনে ও কী বলল? ঠিকমত সব গুছিয়ে বলতে পেরেছিলি?'

'গেলে তো!'

'যাসনি?'

'ক্ষেপেছিস! সকালের প্রতীক্ষায় ছটফট করতে করতে কোন্ ফাঁকে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, ঘুম ভাঙল সাড়ে নটায়—'

'সাড়ে নটা এমন কি বেলা।'

ঘুম ভাঙার সঙ্গে-সঙ্গে সুধীর এসে হাজির, অফিসে যাবার জন্যে তৈরী। বলল, 'কাল রাতে আপনার কী হয়েছিল হেমন্তদা? সারা রাত বিড় বিড় করেছেন।' বলে মুখ টিপে হাসল। 'এবার ছাড়ুন হেমন্তদা, দিনকে দিন শরীরটা কী হচ্ছে দেখছেন। তাছাড়া মেসের সবাই—'

সুধীর বেরিয়ে যাওয়ার পর এল হারাধন—মেসের চাকর। চায়ের সঙ্গে একটা চিঠি দিল, খানিক আগে এক ছোকরা এসে দিয়ে গেছে। চৌধুরী সাহেবের বাড়ি থেকে এসেছে, মেমসাব পঠিয়েছে।

মেমসাব! নীহার!

তাড়াতাড়ি খাম খুললাম, দু লাইনের চিঠি: আমার ইশকুলের গতকালের ফাংশনের একটা রিপোর্ট পাঠালাম। দয়া করে আপনাদের কাগজে ছেপে দেবেন, কেমন?—নীহার চৌধুরী।

চিঠি পড়ে, গত রাতের ঘটনাটা আগাপাশতলা মনে করে দেওয়ালে আমার মাথা খুঁড়তে ইচ্ছে করল।'

'কেন?'

'কেন? আমি যে এতবড় একটা আহম্মক টের পাওয়ার পর মাথা খুঁড়তে ইচ্ছে করবে না? শুধু মাথা খোঁড়া? ও যদি গতকালের ঘটনা পাঁচজনকে বলে বেড়ায়? কারো ভালোবাসা পাওয়া না পরম সৌভাগ্যের কথা? —জনে জনে এই সৌভাগ্যের ফিরিস্তি দিতে শুরু করে? ফের দেখা হলে কী করে ওর দিকে মুখ তুলে তাকাব—সেই ভাবনায় তো আমার আত্মহত্যা পর্যন্ত করতে ইচ্ছে করছে।'

হেমন্তর আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করছিল। ইচ্ছে করছিল, নিজের আহাম্মুকির পরিচয় দিয়ে ফেলেছে বলে।

হেমন্ত তার আহাম্মুকির পরিচয় দিয়েছে একটি মেয়ের কাছে। এমন মেয়ে যার সঙ্গে ন-মাসে ছ-মাসে দেখা হয়, বাকি জীবনটা অনায়াসেই যাকে সে এড়িয়ে চলতে পারে।

কিন্তু না হোক দেখা, হেমন্তর মন? হেমন্তর মনটা তো কল্পনা করতে ছাড়বে না? কল্পনা করবে, নীহারের মুখে তার আহাম্মুকির কথা শুনে সবাই তাকে নিয়ে হাসাহাসি করছে। তারা যদি তাকে না-ও চেনে কী যায় আসে? খবরের কাগজে যাদের কাণ্ডকারখানা পড়ে আমরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করি তাদের সবাইকে কি আমরা চিনি? তবু একেকটি লোক সম্পর্কে একেক রকম ধারণা তো আমরা গড়ে নিই। কখনও তাকে দৈবাৎ দেখলে সেই ধারণাটাই তো সঙ্গে সঙ্গে মাথায় চিড়িক দিয়ে ওঠে?

তাই স্বাভাবিক। কেননা মানুষের দোষ বলো গুণ বলো কোন কিছুরই অন্য-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব নেই। তুমি হাজারটা খুন করো কেউ যদি টের না পায়, তুমি লক্ষ-কোটি সৎ কাজ করো লোকে যদি না জানে—কোন দাম নেই। এ ঠিক মনের ভাবনার মত। হেমন্ত বলে। হেমন্ত বলত।

কবিতা ছাপাবার জন্যে অবনীকে রাজী করাতে এই সব তাকে বলতে হয়েছিল।

কেউ কিছু না জানলেও নিজের মনের কাছেই চিরকাল গতরাতের ঘটনার জন্যে চোর হয়ে থাকতে হবে বলে হেমন্ত দিশেহারা হয়ে গেছে। গতরাতের ঘটনাটা যে-হেমন্তর জীবনে নেহাত-ই একটা ব্যতিক্রম।

আর বছরের পর বছর ধরে, প্রায় কুড়ি বছর ধরে, যে-আহাম্মুকি অবনী করে এসেছে, যার আহাম্মুকির পরিচয় প্রীতি পেয়েছে, হেমন্ত পেয়েছে, বস্তুত তাকে যারা জানে আহম্মক বলেই জানে—অথচ সে নিজে দিব্যি—

অবনী ঘন ঘন বেডসুইচ টেপে।

কিন্তু বেড সুইচ টিপে কি ফ্যানের স্পীড বাড়ানো যায়—এমন বাড়ানো যে ঘূর্ণিঝড়ের মত প্রচণ্ড হাওয়া উঠবে, অবনীর দুই কানে ধাঁধাঁ লাগবে, অবনীর সমস্ত চেতনা অসাড় হয়ে যাবে, এবং অবনীর মুখ-বুক-পেট থেতলে: চেনার-অযোগ্য-একতাল-হাড়মাংসের-রক্তাক্ত পিণ্ডে পরিণত করে দেবার জন্যে এক চাংড়া চুনবালি সমেত ফ্যানটা নেমে আসবে?

'প্রেম, বুঝলি, প্রেমকরা, প্রেমের কথা বলা, প্রেমের কবিতা লেখা, এমনকি প্রেমের কথা ভাবাও আজ দুরকম অবস্থায় সম্ভব—হয় আমার মত বেহেড হয়ে, নয় তোর মত—'

'হেমন্ত!'

অবনী কি আর্তস্বরে চিৎকার করে উঠেছিল? নইলে হেমন্ত অমন ভড়কে যাবে কেন? খানিকক্ষণ তার মুখের দিকে বেকুবের মত চেয়ে থেকে 'যাক, আজ চলি' বলে হঠাৎ উঠে দাঁড়াবে, পালাতে চাইবে কেন?

সে কি হয়! এমন মারাত্মক কথা বলে ও পার পেয়ে যাবে?

'তুই কি বলতে চাস—'

হেমন্ত বোকা বোকা মুখে বন্ধুর দিকে চেয়ে থাকে। চুপচাপ বন্ধুর কথা শুনে যায়।

অবনী চটে: এই মাত্র যে গলাবাজি করছিল এখন তার মুখে রা নেই। তবে কি ও অবনীর কথাগুলিকে পাগলের প্রলাপ ভাবছে? তাই প্রতিবাদের প্রয়োজন বোধ করছে না?

হেমন্ত দাম্ভিক, নিজেকে ও সবজান্তা ভাবে—অবনী জানে। কিন্তু

অরও একটা সীমা থাকা দরকার। হতে পারে অবনীর চৌহদ্দি বিশ-বাই-বিশ ফুট এই ঘরখানার মধ্যে, হতে পারে সে বিশ বছর এই ঘরের বাইরে পা দেয়নি—কিন্তু মানুষ কি শুধু চোখ দিয়ে দেখে? খালি কান দিয়ে শোনে? পথে পথে টো টো না করলে বাস্তববাদী হওয়া যায় না? আমি যেটুকু দেখলাম তাই সত্যি, যা দেখলাম না তার অস্তিত্ব নেই? তাহলে মানুষের অতীতের কি দশা হবে? ভবিষ্যতের কোন্ গতি? আর পৃথিবীর কতটুকু যায়গাই বা—

'আমি তা বলিনি।'

'কিন্তু তোর কথার মানেটা তাই দাঁড়ায়। যেহেতু আমি ঘর থেকে বেরোতে পারি না, তোর মত পাঁচটা ব্যাপার নিয়ে হইচই করতে পারি না, অতএব আমি কল্পনাবিলাসী, কল্পনার মদে চুর। তোরা বাস্তববাদ বলতে শুধু ঘটনা বুঝিস, কিন্তু ঘটনার যে অন্তর্নিহিত সত্য—'

'ঘটনার অন্তর্নিহিত সত্য! তুই বুঝিস?'

'বুঝি বইকি। তোদের চেয়ে বেশি বুঝি। দুহাত দূরের বেশি তোদের নজর চলে না—'

'আর তুই অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ ত্রিকালদর্শী! ননসেন্স।'

'হেমন্ত, নিজেকে তুই বড় বেশি চালাক ভাবিস বলেই আট বছর বিয়ে করেও আজ পর্যন্ত সংসার পাততে পারলি না। বাস্তববাদের বড়াইটা তোর অক্ষমতার অজুহাত ,আসলে তুই একটা কাপুরুষ, ভীতুর বেহদ্দ, অপদার্থ—'

হঠাৎ হেমন্ত সোজা হয়ে বসে। তার দুই চোখের তারা ঝিকিয়ে ওঠে। অতিপরিচিত বন্ধুর এ কী রূপ! চমক খায় অবনী।

তারপর পর্দায় পর্দায় সেই চমকের মাত্রা চড়েছে। চমকের জগদ্দল চাপে সমস্ত বোধবুদ্ধি এক সময় ভোঁতা হয়ে পড়েছে।

অনর্গল কথা বলে গেছে হেমন্ত। যুক্তি দিয়ে দিয়ে উদাহরণ দিয়ে দিয়ে ঝানু উকিল যেমন ভাড়াটে গেঁয়ো সাক্ষীকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ে অবনীকে তেমনি নাজেহাল করে দিয়েছে।

হেমন্ত কি আজ বিশ্বাসঘাতকতা করল? মিথ্যার মুখোশ ছিঁড়ে দেওয়া

বিশ্বাসঘাতকতা—সে-মুখোশ যদি মুখশ্রী হয়ে মুখের সঙ্গে এঁটে গিয়ে থাকে?

নাকি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এতকাল? বিশ বছর ধরে বন্ধুকে মিথ্যার মোহে ভুলিয়ে রাখাই বিশ্বাসঘাতকতা?

বিশ্বাসঘাতকতা শেষেরটা। মন না চাইলেও স্বীকার না করে উপায় নেই: মিথ্যার আয়ু বাড়লেই তা সত্য হয়ে ওঠে না।

এতদিন হেমন্ত তার সঙ্গে প্রতারণা করে এসেছে।

হেমন্ত, অবনীর অদ্বিতীয় বন্ধু হেমন্ত, একটা জোচ্চোর। ধাপ্পাবাজ।

না, তার চেয়েও বেশী। আসলে সে—আসলে সে—

হেমন্তর সঙ্গে খাপ খায় জঘন্যতম একটা বিশেষণের হদিশ করতে করতে অবনীর খেয়াল হয়—হেমন্ত নিমিত্ত মাত্র। যাবার সময় ও তো নিজের মুখেই স্বীকার করে গেল, 'তোর বাবাকে কথা দিয়েছিলাম বলে, তাঁর কাছে ঋণী ছিলাম বলেই এতদিন কৃতজ্ঞতাবশে—'

অতএব আসল আসামী হেমন্ত নয়—অক্ষয় চাটুয্যে। ক্ষণজন্মা পুরুষ অক্ষয়কুমার। অবনীর পরমপূজনীয় পিতৃদেব। ঘটনাচক্রে।

ঘটনাচক্রে বই কি।

অনেককাল পরে অবনীর বাবার কথা মনে পড়ল। সে যেন আরেক জন্মের কথা।

মানুষ সবকিছু তার বুদ্ধি, বিবেচনা খাটিয়ে গ্রহণ করে। গ্রহণ বা বর্জন। সেইখানেই মানুষ মানুষ, পশু পশু।

কিন্তু জন্মের ওপর মানুষের কোন হাত নেই। তার বুদ্ধি-বিবেচনার কোন দাম নেই। তবু সে মা-বাবার পরিচয়ে বুক ফোলায়, মাথা হেঁট করে।

তুমি অমুকের ঔরসে তমুকের গর্ভে জন্মেছ বলে তোমার কি কোন বাহাদুরি আছে? বাহাদুরি বা লজ্জা?

অথচ জন্মসূত্রে বাহাদুর অবনী।

আর জন্মসূত্রেই যুগলকে ইশকুল ছেড়ে যেতে হল।

অক্ষয় চাটুয্যে বাহাদুর নিঃসন্দেহে। মুড়ি-বেচা বিধবার ছেলে হারান।

ছেলেবেলায় সে-ও বাড়ি বাড়ি গিয়ে মুড়ি দিয়ে এসেছে। বারো বছর বয়সে গ্যাঞ্জেস মিলের বড় সাহেবের খাশ বেয়ারা। তারপর বছর দুই রঙকলে, বছর দেড়েক নন্দীদের ছাপাখানায়। উনিশে মা মারা গেল সন্ধ্যা সাতটায়, আটটায় সে বেপাত্তা। কেউ বলে মার শোকে গঙ্গায় ডুবে মরেছে, কেউ বলে দেশ ছেড়ে পালিয়েছে—বোম্বাই কিবার্মা। আবার কারও ধারণা নাগপুর প্যাসেঞ্জার অ্যাকসিডেণ্টে যে লোকগুলির লাস রেলকোম্পানী গুম করে ফেলেছে হারানও আছে তাদের মধ্যে। ওর মত কুপুত্রের এ ছাড়া আর কী পরিণাম হতে পারে।

আট বছর পরে ফিরে এসেছে হারান। হারানকে দেখে তখন চেনা দুষ্কর।

সেই হারান কী করে অক্ষয়বাবু হয়ে উঠল, দেখ্-দেখ্ করতে করতে তার লেদ মেশিনটা কী ভাবে ডালপালা ছড়াল, প্রভাবতী মেশিনারিজ কোম্পানীর পত্তন হল, গাড়ি হল বাড়ি হল, রামকানাই মুখুজ্জের নাতনী বউ হয়ে এল—সে এক অবিশ্বাস্য কাহিনী।

অবিশ্বাস্য হলেও সেই কাহিনীর প্রত্যক্ষদর্শী আছে। একদিকে তারা যেমন অক্ষয়ের নামে যা-তা বলে, অন্যদিকে তার জয়জয়কার করে। হারানের অক্ষয় হয়ে ওঠার পিছনে যত রহস্যজনক কারণই থাকুক—হারান যে বাহাদুর সে-সম্পর্কে কারো কোনও সন্দেহ নেই।

বাপের বাহাদুরি স্বীকার করে অবনীও। জন্মের তোয়াক্কা না রেখে একটি মানুষ নিজের জীবন নিজে নির্মাণ করেছে, সবার মাথা ছাপিয়ে উঠেছে—বাহাদুরি বইকি। প্রচণ্ড রকমেরই বাহাদুরি। কিন্তু সেই বাহাদুরির জের অবনীকেও কেন টানতে হবে? অক্ষয় চাটুয্যের ছেলে হয়ে জন্মেছে কি সে নিজের ইচ্ছেয়?

'জানিস যুগল, আমায় যদি ভগবান জিজ্ঞেস করত তুমি কার ছেলে হতে চাও, আমি বলতাম ইতিহাসের স্যার রামদাসবাবুর।'

'দূর বোকা! রামদাস বাবু যে বিয়েই করেন নি।'

'ভগবান চাইলে নিশ্চয় করতেন।'

'কিন্তু রামদাসবাবুকে কজন চেনে। আর তোর বাবাকে—'

তাতে আমার কি বাহাদুরি? অবনী প্রতিবাদ করতে গিয়েও করে না। মনে পড়ে যায় যুগল তার বাপের একমাত্র সন্তান। বাপ যেমন ছেলেকে ভালোবাসে যুগলও তেমনি বাপঅন্ত প্রাণ। কেউ নিজের বাপের নিন্দে করছে যুগল সইতে পারে না।

অথচ যুগলের বাপ নেহাতই একটা নগণ্য মানুষ। পাট কলে কাজ করে, কেউ তার সঙ্গে আপনি-আজ্ঞে করে কথা বলে না। এমন-কি যুগলের সমবয়সীদের অনেকেই তাদের বাপদাদাদের দেখাদেখি তাকে তুমি করে বলে। যুগলরা থাকে বিপ্রদাস লেনের বস্তিতে।

আর অবনীর বাপ মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, ইশকুল কমিটির ফাউণ্ডার-প্রেসিডেণ্ট, এ তল্লাটের প্রতিটি ক্লাব-লাইব্রেরির মাতব্বর। মাসিকে তার জীবনী বেরোয়, খবরের কাগজে ছবিসমেত বক্তৃতা ছাপা হয়।

দস্তরমত রাশভারি মানুষ অক্ষয় চাটুয্যে। বিনা প্রয়োজনে কথা বলেন না, হাসিঠাট্টা গল্পগুজবের ধারেকাছে নেই। নেহাত পাঁচ জনে চায় বলেই পাঁচটা অনুষ্ঠানে যান, নইলে কারখানাই তাঁর জীবনের ধ্যানজ্ঞান। ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে ওঠেন, দিনের প্রতিটি কাজ ঘড়ির কাঁটায় বাঁধা।

সভায় যান দেশী ধুতি আর গরদের পাঞ্জাবি পরে, সাহেবসুবোর সঙ্গে দেখা করতে হলে দামী সুট, কিন্তু কারখানায় যখন থাকেন পরনে আট হাতি থান, গায়ে লঙক্লথের ফতুয়া। কী শীত কী গ্রীষ্ম। কারখানার প্রত্যেক ডিপার্টের প্রতিটি কাজ তাঁর নখদর্পণে। মজুরদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কাজ করতে তাঁকে প্রায়ই দেখা যায়।

নিন্দুকরা অবশ্য আড়ালে বলে, অতিশয় ঘুঘু লোক। পাছে কেউ কাজে ফাঁকি দেয় তাই চোখে চোখে রাখে, পাছে মজুররা ইউনিয়ন করে বিগড়ে যায়, ভোলা পাছালের মত বেকায়দায় ফেলে—সবার সঙ্গে তাই ভাবসাব রাখে।

কিন্তু এসব কুৎসা যারা রটায়, অবনী জানে, তারাই আবার নিজেদের ছেলেদের অক্ষয় চাটুয্যেকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণের জন্তে উপদেশ দেয়,

স্বাধীন ব্যবসার মাহাত্ম্য বোঝাতে অক্ষয় চাটুয্যের উদাহরণ টানে, গরজের সময় অক্ষয় চাটুয্যের ছেলেকে পর্যন্ত বাপ ডাকে। যেমন নিধু কাকা।

এই নিধুকাকাই না একদিন চোদ্দ বছরের অবনীর হাত ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলেছিল: নগেনের চাকরিটা যাতে না যায় সেজন্যে সে যেন তার বাপকে বলে। দয়া করে বলে। নইলে এই বুড়ো বয়সে গুষ্টিসমেত না খেয়ে—

সে কি দমকে দমকে কান্না বুড়ো মানুষটার। কে বলবে কদিন আগেই এই লোক ঘোষেদের রকে বসে অক্ষয় চাটুয্যের শ্রাদ্ধ করেছে। রাখালদা কোত্থেকে শুনে এসে মাকে বলে। মা অবশ্য কান দেয় নি।

নিধুকাকাকে অবনী কথা দিয়েছিল, কিন্তু রাখেনি।

কী করে রাখবে? বাবার সাথে কি তার দেখা হয়। সে ঘুম থেকে ওঠার আগেই বাবা বেরিয়ে যান। দুপুরে বাবা যখন খেতে আসেন, সে থাকে ইশকুলে। ইশকুল থেকে ফিরেও বাবার দেখা মেলে না।

বাবার কত কাজ! দুদণ্ড বাড়ির কারো সঙ্গে বসে গল্প করার সময় কই বাবার!

কাজ এবাড়ির সকলের। মা থেকে শুরু করে বাড়ির প্রত্যেকটি মানুষ সব সময় কাজে ব্যস্ত। সেলাই রান্না সাজগোছ নিয়ে দিদি। মা-ও সারাদিন কাজ করেন। ঝি-চাকর দূর সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজন সবাই কাজ করে। কাজ কাজ কাজ। বাড়িতে কাজের হট্টগোল লেগেই আছে। হর্দম লোকজন যাওয়া-আসা করছে। 'অত বড় বাড়িতে নিরিবিলি একটা জায়গা পাওয়া দুষ্কর।

ভালো লাগে না অবনীর। ইশকুল থেকে ফিরে সে বাগানে বই নিয়ে বসে। বইয়ের মানুষগুলিকেই তার আপন মনে হয়। বাস্তবে সবাই তাকে কখনই ভুলতে দেয় না যে সে অক্ষয় চাটুয্যের ছেলে, কিন্তু বই পড়তে পড়তে অবনী নিজেকে কখনো ভাবে অচিন দেশের রাজপুত্তুর, কখনো আফ্রিকার বীর শিকারী, কখনো-বা দুঃসাহসী পর্যটক মার্কো

পোলো। না, রাজপুত্তুর না, আফ্রিকার বীরশিকারী না, মার্কো পোলো-ও না—গরিব এক ছুতোর মিস্ত্রির ছেলে অবনী, নিজের চেষ্টায় যে বড় হয়েছিল, দেশের সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছিল। না, দেশের নেতাও নয়, অবনী সেই কবি, কবিতা লেখার জন্যে যে সংসারের সুখদুঃখের দিকে তাকায়নি, সবাই তাকে ঠাট্টাবিদ্রূপ করলেও আপন মনে শুধু কবিতাই লিখে গেছে। নদীর ধারে ছিল তার ছোট্ট কুটীর। একদিন সে কুটীরে বসে কবিতা লেখায় এমনই তন্ময় হয়ে ছিল যে কখন শত্রুসৈন্য চড়াও হয়েছে টের পায়নি। শত্রু-সৈন্য তার কুটীর তছনছ করেছে, জানতেও পারেনি। তার ঘাড়ে যখন তরোয়ালের কোপ পড়েছে, তখনও সে কবিতা লিখছিল। তারপর, তার মৃত্যুর পরে, তার কবিতাই তাকে অমর করে তুলল। তার কবিতা পড়ে মানুষ দ্বেষ হিংসা ভুলল, যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ হল, মানুষের মধ্যে ছোটবড় ভেদাভেদ মুছে গেল, সবাই সবাইকে ভালোবাসল, প্রত্যেকে প্রত্যেকের আত্মীয় হয়ে উঠল। আর অবনী যে-কুটীরটিতে থাকত সেখানে তৈরী হল মস্ত একটি মন্দির। সেই মন্দিরে অবনীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা হল। মন্দিরে সকাল-সন্ধ্যা আরতি হয়, পুজো হয়, ধূপধুনোর গন্ধে কাঁসর-ঘণ্টার আওয়াজে সমস্ত জায়গাটা গম গম করে। দেশবিদেশ থেকে লোক আসে। সে যেন এক তীর্থ ক্ষেত্র। সবাই এসে অবনীর মূর্তিকে প্রণাম করে, পুষ্পাঞ্জলি দেয়।

অবনী ছ্যাখে। হ্যাঁ, শ্বেতপাথরের অবনী ছ্যাখে। তরোয়ালের কোপে মাথাটা খসে পড়লেও অবনীর কি মৃত্যু আছে? অবনী যে কবি! কবিরা যে অমর!

মা প্রায়ই অনুযোগ দেন, 'দিনকে দিন তুই কি ঘরকুনো হচ্ছিসরে। দৌড়ঝাঁপ না করলে—'

'আমি তো একসারসাইজ করি মা। রোজ ডন-বৈঠক—'

'এই নাকি ডন-বৈঠক-করা চেহারা! এক কাজ কর, তোর কোথাও যেতে ভালো না লাগে তোর বন্ধুদেরই ডেকে আন। ব্যাডমিণ্টন খেল।'

'আচ্ছা।'

মার পীড়াপীড়িতে তাই করতে হয়। কিন্তু দুদিন যেতেই ব্যাডমিণ্টন

খেলার সাধ মিটে যায়ঃ সবাই তার পার্টনার হতে চায় কেন? প্রত্যেক গেমে সে যেতে কেন? অমন যে তুখোর খেলোয়াড় দিনেশদা সে-ও তার কাছে হেরে যায় কেন?

সে অক্ষয় চাটুয্যের ছেলে বলে?

সন্ধ্যেয় পরপর দুজন মাস্টার আসেন। পড়ার ঘরে বসে মোটরের হর্নে অবনী টের পায় বাবা ফিরলেন। আধঘণ্টা পরে ফের মোটরের হর্ন—বাবা বেরিয়ে গেলেন। বাবার পরনে এখন হয় দেশী ধুতি গরদের পাঞ্জাবি, নয় দামী স্যুট। অবনী কল্পনা করে নেয়।

কোন কোন দিন সন্ধ্যেয় বাবা আসেন না, অবনীরা চার ভাইবোনে খেতে বসেছে, মা সামনে বসে দেখাশোনা করছেন—বাবার মোটরের হর্ন শোনা যায়। সঙ্গে সঙ্গে মা ওপরে চলে যান।

আবার, অবনী শুয়ে পড়েছে, ঘুম-ঘুম এসেছে, বাবার মোটরের হর্ন শুনে চমকে উঠেছে—এমনও ঘটে মাঝে মাঝে।

সুতরাং নগেনদার চাকরির কথা কখন বলবে বাবাকে?

এক রাত দশটার পরে। যেখানে যত কাজই থাকুক দশটার মধ্যে বাসায় বাবা ফিরবেনই। ফিরে স্নান করে, কি শীত কি গ্রীষ্ম, ঘরে গিয়ে ঢুকবেন। হাজার জরুরি কাজেও অক্ষয় চাটুয্যের দেখা তখন মিলবে না।

কিন্তু রাত দশটার পর বাবার ঘরে?

দশ বছর বয়েসের একটা দৃশ্য মনে পড়ে যায়।

চোদ্দ বছরের অবনীর দুই চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে।

পরে, পরবর্তী জীবনে, পরবর্তী জীবনে মানে হাসপাতাল থেকে ফিরে জন্মের মত শয্যাশায়ী হওয়ায় পরে, যদিও অবনী নিজের ভুল বুঝেছে—কিন্তু তার আগে পর্যন্ত? দশ বছর বয়েস থেকেই কি সে বাবাকে ঘৃণা করতে শুরু করেনি?

প্রথমে বাবাকে ঘৃণা? পরে মাকে ঘৃণা?

এবং বাবা-মাকে ঘৃণা করার সাথে সাথে চাটুয্যে-বাড়ির পরিবেশটাকেই ঘৃণা করতে শুরু করেনি?

তাই না 'তুমি অক্ষয়বাবুর ছেলে!' বলে কেউ যখন গদগদ হয়ে ওঠে অবনীর সাধ যায় চিৎকার করে বলে, না না না! দোহাই তোমার, ওকথা বোলো না! আজ তুমি অক্ষয় চাটুয্যের ছেলে বলে আমার পিঠ চাপড়াচ্ছ, আমায় কোলে টানছ, কিন্তু আমার বাবার সব পরিচয় কি জানো? জানলে সঙ্গে সঙ্গে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবে। যেমন ক্লাসের ছেলেরা যুগলকে দেখে নিয়েছে, যুগলকে এক ঘরে করে, তার বাবা-মার নামে বোর্ডে যা-তা লিখে, বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি ছবি এঁকে শেষ পর্যন্ত তাকে ইশকুল ছাড়া করে ছেড়েছে। কিন্তু কেন? যুগলের কি অপরাধ?

ছোটকা রোজ মার ঘরে শোয়, অবনী কি একদিন পারে না? না হয় ছোটকার বয়েস ছয়, অবনীর দশ। কিন্তু ছোটকা যেমন ছোট তেমনি অবনীই তো ছোটকার আগে এসেছে? সেই হিসেবে মার ওপর তারই দাবি কি বেশি নয়?

মা প্রবোধ দিয়েছেন, 'বেশ তো তুই এখন ঘুমো। আমি শুতে যাওয়ার সময় তোকে নিয়ে যাব।'

যাননি।

পরের দিন সকালে বলেছেন, 'তুই ঘুমিয়ে পড়েছিলি। আমি দুবার ডাকলাম, সাড় নেই। তাই—'

অবনী ঘুমিয়ে পড়েছিল? তবে কি সে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেছে? স্বপ্নে বারান্দার ঘড়িতে দশটা বাজার এগারোটা বাজার শব্দ শুনেছে? রাস্তায় যে ঘোড়ার গাড়ির টং টং আওয়াজ শুনেছিল সে-ও ঘুমের ঘোরে? কুকুরের ডাকও?

হতে পারে। রোজ কত আশ্চর্য আশ্চর্য স্বপ্নই তো দেখে অবনী। ঘুমোলেই স্বপ্ন দেখে।

'আজ আমি জেগে বসে থাকব।'

'থাকিস।'

সত্যিই সেদিন জেগে বসে ছিল। দিদি ঘুমিয়ে পড়লে উঠে বসেছে। অন্ধকারে একা বসে থাকতে গা ছমছম করায় দিদিকে ছুঁয়ে থেকেছে।

মা আসেননি। মা সিঁড়ির দরজায় তালা লাগালেন, তাদের ঘরের সামনে দিয়ে গেলেন; নিজের ঘরে ঢুকে দরজায় খিল দিলেন—তখনও অবনী প্রতীক্ষা করেছে : হয়ত ভুলে গেছেন, শোবার সময় নিশ্চয় মনে পড়ে যাবে, তখন আসবেন।

আসেননি।

অমন যে ভয়কাতুরে অবনী সে তখন একাই খাট থেকে নেমেছে, ঘর থেকে বেরিয়েছে। সে-ই মার কাছে যাবে, ভুল ধরিয়ে দিয়ে মাকে ভীষণ অবাক করে দেবে।

অন্ধকার বারান্দা। পাশের ঘরে পিশিমা। তার পরে একটি ঘর বাদ দিয়ে মার ঘর। সবার শেষে বাবার ঘর। মার ঘরের জানালার একটি পাট বুঝি খানিকটা খোলা, তাই এক ফালি নীল আলো বারান্দায় এসে পড়েছে।

তাড়াতাড়ি অন্ধকারটুকু পেরিয়ে যায় অবনী, আলোর ফালির কাছে এসে পা টিপে টিপে এগোয়।

ঘরের মধ্যে ফিশফাশ কথা শোনা যাচ্ছে। মা ঘুমোন নি। কে জানে, হয়ত ছোটকা জেগেছে, তাই তাকে ডাকেন নি। যা হিংসুটে হয়েছে ওটা! ছোটকাকে এখন ঘুম পাড়াচ্ছেন। ওকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে তাকে ডাকবেন। অবনী ততক্ষণ দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকবে। তারপর যেই-না মা ঘর থেকে বেরোবেন, অমনি মার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বে; মা ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠবেন ? উঠুন না। কী গ্রাণ্ড মজাই-না হবে তাহলে !

মজা! গ্র্যাণ্ড মজা!

কী ভাবে অবনী মার ঘরের জানালা থেকে পালিয়ে এসেছিল, মনে নেই। শুধু মনে পড়ে ঘরে ঢুকেই সে দিদির ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। দুহাতে দিদিকে জাপটে ধরেছিল। বোবায়-পাওয়া মানুষের মত গোঙাতে শুরু করেছিল : ভয়! ভয়! ভয়! ভয়ঙ্কর একটা দুঃস্বপ্ন দেখে প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে অবনী। ভয়ে অবনীর দম বন্ধ হয়ে আসছে। ভয়ে অবনীর গলা শুকিয়ে আসছে। মাথা ঘুরছে। বুক ধড়াস ধড়াস করছে।

মাকে ভয় দেখাতে গিয়েছিল যে-অবনী মাকে দেখেই ভয়ে তার সর্বাঙ্গ এখন ঠকঠক করছে।

দিদি যেন কী জিজ্ঞেস করেছিল, অবনী শোনেনি, পাগলের মত দিদির বুকে সে কেবলি মুখ ঘষছিল। দুহাতে দিদিকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে।

দিদি কি কিছু বুঝেছিল? মাকে বলেছিল? নইলে তার পরদিনই শোবার ঘরের ব্যবস্থা বদলানো হল কেন?

পিশিমা এলেন দিদির ঘরে, অবনীকে পাঠানো হল পশ্চিমের ঘরে দাদার সঙ্গে শুতে।

আরও আশ্চর্য, রাত্রে অমন কাণ্ড করল অবনী, কিন্তু কই, পরের দিন সকালে তো দিদি কিছুই জানতে চাইল না?

তাহলে দিদিও বুঝেছিল ব্যাপারটা। এবং দিদিও জানত। জানত বলেই কোন কথা তোলেনি।

শুধু দিদি না, দাদাও জানত, পিশিমাও জানতেন। কে জানে, বাড়ির ঝি-চাকরেও জানত হয়ত। অবনীর তো ধারণা—দেশসুদ্ধ সবাই জানে: বাবার নাড়িনক্ষত্রের খবর রাখে লোকে, এটা জানে না। কিন্তু এ-নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। কেননা অক্ষয় চাটুয্যে যে ক্ষণজন্মা পুরুষ। হ্যাঁ, 'বসুন্ধরা'য় বাবার যে-জীবনী বেরিয়েছে তাতে 'ক্ষণজন্মা-পুরুষ' কথাটাই ছাপার অক্ষরে ছিল। রাখালদা মাকে পড়ে শোনাবার সময় কথাটার মানে বুঝিয়ে দিয়েছিল। এমন একটা বিশেষণ বসাতে পেরেছে বলে রাখালদার বড় গর্ব।

সবাই জানলেও ব্যাপারটাকে কেউ গুরুতর মনে করেনি। তাই দিদি বলে দিয়েছে ভেবে কী ভাবে সে মার মুখোমুখি তাকাবে—এই অস্বস্তিতে অবনী যখন ছটফট করেছে, মা আগের মতই সহজভাবে তাকে স্নান করিয়ে দিয়েছেন, চুল আঁচড়িয়ে দিয়েছেন, সামনে বসে খাইয়ে কাপড়-জামা পরিয়ে কপালে চুমো দিয়ে ইশকুলে পাঠিয়েছেন।

আড়ে আড়ে মাকে দেখেছে অবনী। দেখে অবাক হয়েছে: এই মাকেই কি ওই অবস্থায় দেখেছিল?

ঘরে নীল আলো। ছোটকা খাটে নেই। বাবা মার ঘরে। মেঝের গালিচা পেতে দুজনে বসে। বাবার পরনে সিল্কের লুঙি, গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি। পাঞ্জাবির বুক খোলা। ময়লা-মোটা পৈতেটা দেখা যাচ্ছে।

ডান দিকে কাত হয়ে তাকিয়ায় কনুই রেখেছেন বাবা, তাঁর ডান হাতে গেলাস, বাঁ হাত মার কোলে। মা বাবার গেলাসে সোডা ঢালছেন।

মা সারাদিন যাঁর পরনে থাকে চওড়া লালপাড় শাড়ি, গায়ে কুর্শির কাজ-করা শাদা ব্লাউজ, হাতে দুগাছা করে মোটা রুলি আর গলায় একটা বিছে হার—তাঁর সারা শরীরে এখন এক টুকরো ন্যাকড়া নেই।

কাঁচা সোনার মত গায়ের রঙ মায়ের। তেমনি টানা-টানা চোখ, মুখের গড়ন, দেহের বাঁধন। এই রূপের জন্যেই মা নাকি গরিব ঘরের মেয়ে হয়েও অক্ষয় চাটুয্যের বউ হতে পেরেছেন। সবাই মাকে বলে জগদ্ধাত্রী।

সেই জগদ্ধাত্রীর রূপ এখন ফেটে পড়ছে: পরিপাটি করে বাঁধা খোঁপায়, সিঁথিতে, কানে, নাকে, গলায়, বাহুতে, মণিবন্ধে, আঙুলে, কোমরে, পায়ে তাল তাল সোনা-রূপো-মণিমুক্তো-হীরার ঝলসানি।

ঘটনাটা সত্যি তো? রোজকার মত সে রাতেও অবনী স্বপ্ন ছাখেনি তো?

তারপর কতদিন মাকে স্বপ্নে দেখেছে অবনী। মাকে, বাবাকে।

যে-সত্যকে সে স্বপ্ন ভেবে সান্ত্বনা পেতে চেয়েছিল, স্বপ্নে বার বার দেখে সেটাই তার কাছে আরও জীয়ন্ত সত্য হয়ে উঠেছে।

শুধু তাই? তারপর থেকে মা-বাবাকে কখনো একসঙ্গে দেখা মাত্র দিনের বেলাতেও কি সেই রাতের ছবিটা মনে পড়ে যেত না? সঙ্গে সঙ্গে শরীর শিউরে উঠত না? দু চোখ আপনা-আপনি বুজে আসত না?

এই মা-বাবার ছেলে আমি! কী বাহাদুরি আমার?

আর যুগল—

যুগল ফার্স্ট হয়, অবনী সেকেণ্ড।

যুগলের বাবা শান্তশিষ্ট নিরীহ মানুষ। সবাইকে সমীহ করে চলে। ছেলের বন্ধু যে-অবনী তাকে পর্যন্ত দাঠাকুর বলে একদিন প্রণাম করেছিল।

অবনী হাঁ হাঁ করে উঠতে এক গাল হেসে বলেছিল, 'বামুনের ছেলে, নতুন পৈতে হয়েছে—কেউটের বাচ্চা কেউটে! পেন্নাম করবুনি।'

ব্যাপারটা শুনে যুগল কিন্তু চটে লাল। 'বাবার প্রণাম তুই নিলি কেন?'

'বারে, বামুনকে তো সবাই—'

'বামুন! বামুনের ছেলে হয়ে জন্মালে, গলায় দড়ি ঝোলালেই বামুন? ইতিহাসের স্যার কী বলেন মনে নেই? কত তপ-তপস্যা করলে তবে না আগেকার দিনে—'

ভুল হয়ে গেছে। ভয়ানক ভুল। অক্ষয় চাটুয্যের ছেলে হয়ে জন্মানোর মত বামুন হয়ে জন্মানোতেও কোন বাহাদুরি নেই। ইতিহাসের স্যারের কথা নতুন করে মনে পড়ে: মানুষকে বড় হতে হয় তার নিজের যোগ্যতায়, নিজের পরিচয়ে। তবেই বাহাদুরি।

সেই হিসেবে বাহাদুর অক্ষয় চাটুয্যে। বাহাদুর যুগল। তার মা যদি একদিন বেশ্যা থেকে থাকে, যুগলের তাতে কী দোষ? বরং বেশ্যার ছেলে হয়েও যে যুগল ভদ্রলোকের ছেলেদের ওপর টেক্কা দিয়েছে সেটাই বাহাদুরি। যুগলও একটা ছোটখাট ক্ষণজন্মা পুরুষ বলতে হবে।

তবু যুগলকে ইশকুল ছেড়ে যেতে হল।

ভাগ্যিশ সময়মত সত্যটা জানাজানি হয়ে গেল! নইলে যুগল নির্ঘাত ম্যাট্রিকে স্কলারশিপ পেত। তখন যদি ফাঁস হয়ে যেত যে সে বেশ্যার ছেলে, ওর মা আগে ঘোলাডাঙায় থাকত, ওর বাপ যাতায়াত করত, পরে কালীঘাটে গিয়ে মালাবদল করে ঘরে নিয়ে আসে—সারা ইশকুলের বদনাম। লজ্জায় মাথা কাটা যেত সবার।

সত্যের কী মহিমা! সত্য সূর্যের মত—কারো সাধ্য নেই চেপে রাখে। দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বলেন হেডমাস্টার মশায়।

আরও একটা সত্য ফাঁস করে দেবে নাকি অবনী? ক্লাসে একদিন দাঁড়িয়ে উঠে বলবে—

বলা যায় না। বলা যায় না। পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম—জননী জন্মভূমিশ্চ!

যুগল ইশকুল ছাড়াতে খুশী হয়েছিল সবাই। বড়দা বাদে।

'তোকে ফার্স্ট করার জন্তেই যুগলকে মতলব করে তাড়ানো হল। যত সব জোচ্চরি। যুগলের মা ইয়ে ছিল কে না জানত? এ্যাদ্দিন কিছু বলেনি কেন?'

মা যে বলেন, দাদা তাকে হিংসে করে, ঠিকই বলেন তাহলে? এবার থেকে অবনী ফার্স্ট হবে বলে হিংসের চোটে দাদা এই কথা বলছে? এমন ভাবে দাদা কথা কইছে যেন যুগলকে তাড়ানোর পিছনে অবনীরও হাত ছিল। ক্লাসের ফার্স্ট বয় হবার জন্তে অবনী যেন ব্যাকুল বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল।

দাদা কি জানে না অঙ্ক ও সংস্কৃত ছাড়া আর সবেতেই অনেক বেশি নম্বর পেয়ে ফার্স্ট হয় অবনী? ইচ্ছে করলে অঙ্ক ও সংস্কৃতেও সে যুগলের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে? স্যারেরাও তাই বলেন। কিন্তু ক্লাসে ফার্স্ট হওয়ায় তার গরজ নেই বলেই ও নিয়ে সে মাথা ঘামায় না।

দাদা কি জানে না অবনীর কত বড় বন্ধু যুগল? যুগলের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করত বলে, যুগলদের বাড়ি একদিন গিয়েছিল বলে—দাদাই না মার কাছে নালিশ করেছিল?

রাগ নয়, দাদার জন্তে অবনীর দুঃখ হয়। পড়াশোনায় দাদার মাথা নেই, মনও নেই। পাছে জবাব দিতে না পারে, ক্লাসে কোন স্যার ওকে প্রশ্ন করেন না। কোনমতে পাশ নম্বর পেয়ে দাদা চিরকাল ক্লাসে উঠেছে। টেস্টেও সেইভাবে অ্যালাও হয়েছিল। হঠাৎ বাবার কি খেয়াল হল—টেস্টে অ্যালাও হওয়া সত্ত্বেও দাদাকে পরীক্ষা দিতে দিলেন না, কারখানায় নিয়ে চললেন। দাদা এখন কারখানার কাজ শিখছে। মালিকের ছেলে হলেও মজুরদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে তাকে কাজ করতে হচ্ছে। এ নিয়ে মার কাছে প্রথম প্রথম কান্নাকাটি করেছে, ফল হয়নি।

ফল হবে না জানা কথা। বাবার ইচ্ছের বিরুদ্ধে যাবার সাধ্য কারো নেই।

ম্লান হেসে অবনী বলে, 'এভাবে ফার্স্ট হতে আমি চাইনি, দাদা।'

'তুই না চাইলে কি হবে তোকে ফার্স্ট করায় হেডমাস্টারের স্বার্থ আছে। তুই ফার্স্ট হলে বাবা খুশী হবেন। বাবা খুশী হলে হেডমাস্টার

যতই বাতে ভুগুক আর ইশকুল কামাই করুক চাকরি যাবে না। ইশকুলের দোতলা হবে, আলাদা খেলার মাঠ হবে—'

'তুই ঠিক জানিস যে—'

'তোর মত আমি ঘাসে মানে বইয়ে মুখ গুঁজে পড়ে থাকি না। বাবার প্ল্যানের কথা আমি জানি। আমাকে ইঞ্জিনীয়ার করার সাধ মিটল না, মালুর জন্যে ইঞ্জিনীয়ার বর এনে সেই সাধ মেটাবেন, তোকে ব্যারিস্টার করবেন, ছোটকুকে ডাক্তার করবেন।' বলতে বলতে অনাদি সিগারেটের প্যাকেট বের করে সিগারেট ধরায়। আগে লুকিয়ে-চুরিয়ে সিগারেট খেত, এখন বাড়িতেই খায়। 'বাবা যে কী হিসেবী! প্রত্যেকটি কাজ তাঁর প্ল্যানমাফিক। দেখছি তো!'

আস্তে আস্তে অবনীও ছাখে।

তার ধারণা ছিল সংসারের দিকে বাবার নজর নেই। কারখানা আর বাইরের জীবন নিয়ে তিনি সদা ব্যস্ত। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের শিষ্য বাবা। পড়াশোনা করে কোন ফল হবে না, চাকরিবাকরি করে লাভ নেই—ব্যবসা বাণিজ্যে বাঙালীকে বড় হতে হবে, উন্নত হতে হবে। আচার্যদেবের এই বাণী তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র। তা নয়। চোখ তাঁর সব দিকে। ছেলেমেয়েদের নিয়ে দুদণ্ড বসে গল্প করার সময় না হলেও ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আর পাঁচটা বাপের মতই ভাবেন। যেমন ভাবেন কারখানার ভবিষ্যৎ নিয়ে। প্রতিটি কাজ তার হিসেবমাফিক, মাপাজোকা। কাজ নিয়ে হইচই করতে ভালোবাসেন না বলেই হঠাৎ তাঁর কাজ দেখে সবাই চমকে যায়।

'বড়কা ম্যাট্রিকটা দিলে পারত না?'

'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফেল করার জন্যে।'

'ওর কিন্তু বড় ইচ্ছে ছিল—'

'যে ইচ্ছের ফল নেই তাকে প্রশ্রয় দিতে নেই, গিন্নি।'

জীবনে অক্ষয় চাটুয্যে কখনও হারেন নি বলে গর্ব, হারবেন না বলে তাঁর পণ।

দশ বছর একটানা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান থেকে হঠাৎ রিজাইন করায় সবাই অবাক হয়েছিল।

ছমাস পরে নতুন ইলেকশনেও বাবা দাঁড়াননি।

অক্ষয় চাটুয্যে যে ভবিষ্যৎদ্রষ্টা: আগেই বুঝতে পেরেছিলেন দিনকাল বদলাচ্ছে। কংগ্রেসের নমিনেশন না নিলে জেতা অসম্ভব।

তা কংগ্রেসের নমিনেশন বাবা অনায়াসে পেতে পারতেন। অরবিন্দ ভটচাজ, সুবুদ্ধি দত্ত, রামকিঙ্কর সরকার ইত্যাদি জেলা কংগ্রেসের মাতব্বররা বাড়ি বয়ে এসে সাধাসাধি করেছে। ওঁরা দেশের জন্যে জেল খাটতে গেলে অক্ষয় চাটুয্যের মাসোহারাতেই না ওদের সংসারগুলি খেয়ে-পরে বেঁচে থাকে।

কিন্তু ওদের শত অনুরোধেও বাবা কংগ্রেসের নমিনেশন নেননি। কেউ কেউ অবশ্য বলে সাহেব-সুবোরা চটবে বলে, কিন্তু অবনী জানে তা নয়: কংগ্রেসের দয়ায় জিতলে অক্ষয় চাটুয্যের মান থাকে? মুড়ি-বেচা বিধবার ছেলে হারান কি কারো দয়ায় অক্ষয় চাটুয্যে হয়েছে?

এবং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দাঁড়ালে যে জেতা অসম্ভব হত তার প্রমাণ পাওয়া গেল ইলেকশনের পর—রায়বাহাদুর হেন লোক গোহারা হেরে গেল দ্বিজেনদার কাছে।

দুহাতে জলের মত টাকা খরচ করেছিল রায়বাহাদুর। দ্বিজেনদা টাকা খরচ করবে কি দুবেলা বাড়িতে হয়ত তার হাঁড়িই চড়ে না।

প্রভাবতী মেশিনারিজের মালিক অক্ষয় চাটুয্যে, নিজের হাতে সে এই কারখানা প্রতিষ্ঠা করেছে, ছোট থেকে একে বড় করে তুলেছে, এতগুলি মানুষের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করেছে—সুতরাং তার কথায় কারখানার সবাইকে ওঠ-বস করতে হবে, তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার দাম ষোল আনা দিতে হবে।

যেমন কারখানার তেমনি চাটুয্যে-বাড়ির কর্তা অক্ষয় চাটুয্যে। এই চাটুয্যে-বাড়িও কি একদিন সামান্য একটা খোড়ো ঘর মাত্র ছিল না? বাকি খাজনার দায়ে সেটাও কি নন্দীরা দখল করে নেয়নি? এই চাটুয্যে-বাড়িরও প্রতিষ্ঠাতা সে—অবিকল কারখানার মতই।

অতএব বাড়ির লোকজনেরও অক্ষরের কথায় ওঠ-বস করতে হবে, তার ইচ্ছে-অনিচ্ছের দাম ষোল আনা দিতে হবে।

অনাদিকে দিতে হবে, মালতীকে দিতে হবে, অবনীকে দিতে হবে, অনিমেষকে দিতে হবে। তাদের ভবিষ্যতও অক্ষরে প্ল্যান করে ঠিক করে রেখেছেন—অবিকল কারখানার মতই।

অবনীরা কি তবে মানুষ নয়, যন্ত্র?

পাকা দেখার দিন থেকে দিদির মুখ থমথমে, চোখ ছলছল। পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়।

'তোর কী হয়েছেরে দিদিভাই?' বলতেই অবনীর দু কাঁধে দুই হাত রেখে হু হু করে কেঁদে ফেলল: মরে যাবে। নিশ্চয় সে গলায় দড়ি দিয়ে কি পুকুরে ডুবে মরবে। দোজবরের সাথে বিয়ে হওয়ার চেয়ে মরণ ভালো! মরণ ভালো!

'দোজবরে হলেও জামাইবাবু বিলেতফেরত ইঞ্জিনীয়ার।'

'তাতে কি। আগে একটা বিয়ে করেছিল তো। তাছাড়া—'

মালতী কেঁদেছিল। অবনীকে ছেড়ে দিয়ে বিছানায় পড়ে ফুলে ফুলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল।

কান্নাই শুধু সার হয়েছে। গলায় দড়ি দেয়নি, পুকুরে ডোবেনি, এমন-কি মুখ ফুটে প্রতিবাদ পর্যন্ত জানায়নি। কেন না দিদি জানত প্রতিবাদ নিরর্থক। নগেনদাকে বাবা অত স্নেহ করতেন, কিন্তু মুখে-মুখে একদিন জবাব দিয়েছিল বলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে কারখানার বার করে দেন। পরে নগেনদা এসে পায়ে ধরে, নিধুকাকা এসে ধর্না দেন—বাবার দয়া হয়নি।

শ্বশুরবাড়ি যাবার দিন অবনীকে বুকে টেনে কানে কানে কাঁপা কাঁপা গলায় দিদি বলেছে, 'আমি আর ফিরে আসব নারে। এই তোর সাথে শেষ দেখা!' বলে অঝোরে কেঁদেছে। কিন্তু দ্বিরাগমনের দিন এসেছে খুশিতে ঝলমলে হয়ে: প্রথম পক্ষের বউ নাকি বিয়ের মাস খানেকের মধ্যে মরে যায়, জামাইবাবু লোকটা নাকি ভীষণ ভালো, শ্বশুর-শাশুড়ীর দিদিকে নাকি বড্ড পছন্দ হয়েছে, ওর দুই দেওর দুই ননদ—এই কদিনেই তারা এমন নেওটা হয়ে পড়েছে—

দিদি সুন্দর হয়েছে। কদিনেই শরীরটা ভরন্ত হয়ে উঠেছে। রঙ খুলেছে। চোখে-মুখে একটা চেকনাই দেখা দিয়েছে। নতুন গয়নায় লাল শাখায় সিঁথির সিঁদুরে কুমকুমের টিপে দিদিকে কেমন অচেনা-অচেনা পর-পর মনে হচ্ছে। দিদিকে এখন হুট করে জড়িয়ে ধরতে বাধ-বাধ ঠেকে। মুখোমুখি চেয়ে থাকতে পর্যন্ত।

শুধু চেহারা নয়, চালচলনেও দিদি বদলে গেছে। সব সময় খুশিতে ডগমগ ভাব। যেন হাওয়ায় ভেসে চলে। কথা বলে আদুরে গলায়। ক্ষণে ক্ষণে মাথায় আঁচল দেয়, আঁচল খসায়। থেকে থেকে গিয়ে আয়নায় দাঁড়ায়। ঘুরে-ফিরে নিজেকে দেখে।

এরই নাম বুঝি মানিয়ে নেওয়া। মেয়েরা নাকি ভীষণ মানিয়ে নিতে পারে।

মানিয়ে নিতে তাদের হয়। মানিয়ে না নিয়ে তাদের উপায় নেই। সব ব্যাপারে স্বামীর অনুগামী হয়ে চলাই মেয়েদের ধর্ম। তাই তাদের বলে সহধর্মিনী। যে যাই বলুক, সংসারে স্বামীই মেয়েদের একমাত্র সম্বল। স্বামী দেবতা। বিয়ের আগে দিদির চুল বেঁধে দিতে দিতে মা উপদেশ দিতেন : স্ত্রী যদি সত্যিকারের সহধর্মিনী হয়ে ওঠে তবেই সংসারের সুখশান্তি থাকে।

সংসারের সুখশান্তি! সুখশান্তির জন্যে হন্যে হোক মেয়েরা, স্বামী ছাড়া যাদের গতি নেই। শাড়ি-গয়না আর আর ভালো খাওয়া-পরা ছাড়া যাদের সুখ নেই।

শুধু দিদি কেন, দাদাও দিব্যি কেমন মানিয়ে নিয়েছে। ছোটকা যে ছোটকা সে-ও এখন থেকে ডাক্তার হবার মহড়া দেয় : টিয়াটা মরে যেতে ওইটুকু ছেলে—ঘেন্না নেই ভয় নেই—ছুরি দিয়ে তার পেট চিরেছিল। লাশ-কাটা ডাক্তার সেজেছিল!

খেতে খেতে বিষম খায় অবনী।

মা ষাট ষাট করে ওঠেন। মাথা চাপড়ান।

'জল খা! জল খা!'

ঢক ঢক করে এক গেলাস জল গিলে অবনী বলে, 'মা, আমি কিন্তু ব্যারিস্টার ফ্যারিস্টার হব না।'

'মানে ?' মা হকচকিয়ে যান। 'হঠাৎ একথা উঠল কেন ?'

হাঁ করে চেয়ে থাকে সবাই।

অনাদি তখন ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেয়, 'ওই যে বাবা বলছিলেন না—?'

'এই কথা!' মা হাসেন। 'সে পরের কথা। এখন ধীরেসুস্থে খেয়ে নে দেখি। পাতে যে সবই পড়ে রইল। ওমা, মুড়োতে এখনও হাতই দিসনি!'

'তাহলে মেজবাবু কী হবেন ?' মাংসের হাড় চুষতে চুষতে মিটি মিটি হাসে মালতী। 'কপি ?' খিল খিল করে উঠে। 'পদ্য লিখলে পেট ভরবে ?'

অবনী দিদির দিকে তাকায়: বাড়িতে এই দিদিই না একদিন তার সব চেয়ে বড় বন্ধু ছিল? তার কবিতার একমাত্র পাঠক ? তার হাতের লেখা খারাপ বলে বাঁধানো খাতায় দিদিই না কবিতা নকল করে দিত? তার সেই খাতার ওপরে যে সোনার জলে 'ফুলের গান' লেখা রয়েছে সে-নাম কার দেওয়া ?

'যাদের কিছুই করার মধ্যে নেই তারাই শুধু পদ্য লেখে। তোদের জামাইবাবু বলেন—'

'তুইও যেমন।' মা ফের হাসেন। 'পাগলের কথায় কান দিচ্ছিস! পাশটাস করুক, তখন দেখবি—'

'দেখ!' বলে ভাত ফেলে অবনী তড়াক উঠে পড়ে।

সকলে ভড়কে যায়। 'ওরে, শোন শোন!' বলতে বলতে মা সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসেন।

অবনী ততক্ষণে ঘরে গিয়ে দরজা দিয়েছে। মা দরজা ধাক্কাতেও খোলে না।

বাড়াবাড়ি হয়ে গেল ? কিন্তু এছাড়া উপায় ছিল না অবনীর: দিদির দিকে চেয়ে তার যে কেবলি রাখালদার কথা মনে পড়ছিল। আর অকথ্য একটা আক্রোশে বুকটা জলেপুড়ে যাচ্ছিল। দিদি যদি আর একটি কথা বলত—সে যা-তা বলে বসত। সে বড় বিচ্ছিরি ব্যাপার হত।

তার চেয়ে এই ভালো। সবাই ভাবুক অবনীটা অবাধ্য বেয়াড়া হয়ে গেছে। অবনী তো পাগল ? এ-ও এক ধরনের পাগলামি।

পাগলামি! দিদিও আজ নিজের অতীতকে পাগলামি বলে মনে করে।

এই দিদিই রাখালদাকে লিখেছিল, 'তুমি আমায় উদ্ধার কর। এই পাপ-পুরী হইতে আমায় যেখানে ইচ্ছা লইয়া চল। ইহারা আমায় জোর করিয়া অন্যের সহিত বিয়ে দিতে চায়, কিন্তু ওগো, আমি তোমায় ছাড়া বাঁচব না।'

দিদির প্যাডে লুকিয়ে সেই চিঠি পড়েছিল অবনী। পড়তে পড়তে কী ভেবে 'পাপপুরী' কেটে 'পাষাণপুরী' করেছিল। তারপর দুরকম হাতের লেখা হয়ে যাওয়ায় নার্ভাস হয়ে গিয়ে চিঠিটা ছিঁড়ে এনেছিল। সে-চিঠি এখনও তার কাছে। দেখাবে নাকি সেই চিঠিটা দিদিকে? দাদার সামনে, মার সামনে?

ভালোবাসা! এই ওদের ভালোবাসা! যেমন দিদি, তেমনি রাখালদা।

দিদির বিয়ের যোগাড়যন্ত্র করায় কী উৎসাহ রাখালদার! পনেরোটা দিন যেন ভূতের মত খেটেছে। শুভদৃষ্টির সময় সবার আগে গিয়ে পিড়ি ধরেছিল।

আর অবনী কিনা গল্প-উপন্যাসে নয়, বাস্তবে একটি মেয়ে আর একটি ছেলে—বড়লোকের মেয়ে আর গরিবের ছেলে—ভালোবাসাবাসি করছে বলে নিজের পড়ার ক্ষতি করেও ওদের সাহায্য করেছে, নানা অজুহাতে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে ওদের একা থাকার সুযোগ দিয়েছে!

অক্ষয় চাটুয্যের প্রাইভেট সেক্রেটারি যদি লুকিয়ে বিয়ে করে বসে তার মেয়েকে—কী এক কাণ্ডই হবে ভেবে রোমাঞ্চিত হয়েছে!

পাষাণপুরী! সত্যিই এ-বাড়ি এক পাষাণপুরী। এ-বাড়ির বাসিন্দাদের হৃদয়-মন বলে যেন কিছু নেই। থাকলেও তা বাঁধা পড়ে রয়েছে একজনের কাছে—এ বাড়ির মালিক যিনি।

ভালো খাও, ভালো পরো, ভালো থাকো—এর চেয়ে বড় সাধ এ-বাড়ির নেই। ভালো খেয়ে ভালো পরে ভালো থেকে জীবনে সুখী হওয়ার চেয়ে বড় স্বপ্ন নেই। এখানে থাকা মানে চিরজীবন এই বাড়িরই একজন হয়ে থাকা। ব্যারিস্টার হয়ে এসেও অবনীকে এই মা-বাবার ছেলে হয়ে, এই দাদা-দিদির ভাই হয়ে থাকতে হবে। দিদির জন্যে বাবা যেমন নিজের প্ল্যান মাফিক বর নিয়ে এসেছেন তার জন্যেও তেমনি বউ নিয়ে আসবেন। সে বউ নিশ্চয় দিদির মতই কোন এক মেয়ে হবে।

সে-ও হয়ত কোন-এক রাধাকৃষ্ণকে ভাঙোরেছে অবনীর ঘর করতে আসবে।

পারবে না, অবনী তা সইতে পারবে না। এ বাড়ি ছেড়ে সে চলে যাবে, পালিয়ে যাবে। হারানও একদিন বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছিল, ফিরে এসেছে অক্ষয় চাটুয্যে হয়ে; মেজকাও এই বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে অবনীমোহন হয়ে উঠবে। সে-ও এক নতুন জীবন গড়ে তুলবে: ধন নয় মান নয়—ধরণীর এককোণে একটুকু বাসা। গাড়ি-বাড়ির প্রাচুর্য চায় না, কোনমতে খেয়ে পরে বাঁচতে পারলেই কৃতকৃতার্থ। সে লোহালক্কর দিয়ে কারখানা বানাবে না, কবিতার এক নতুন জগৎ সৃষ্টি করবে। কবিতা, হ্যাঁ কবিতাই লিখবে অবনী। বড় মিলমালিক হওয়ায় বাহাদুরি আছে বড় কবি হওয়ায় নেই? তাকে ঠাট্টা করে দিদি—কই, রবীন্দ্রনাথকে তো করে না? রবীন্দ্রনাথ বড় হয়ে গেছেন বলে?

তাই। বড় হতে হলে প্রথম জীবনে অনেক হেনস্থা সইতে হয়। ইতিহাসের স্যার বলতেন—প্রথম জীবনে যারা উপেক্ষা করে পরে তারাই ফুলের মালা বরণডালা নিয়ে আসে।

ইতিহাসের স্যার! কে জানে, কোন্ জেলে এখন আছেন তিনি। মাঝে মাঝে এমন দেখতে ইচ্ছে করে তাঁকে!

ইতিহাসের স্যার তাঁর মাথায় হাত রেখে একদিন বলেছিলেন 'তোর ওপর আমার অনেক আশা অবু! দশের ভিড়ে কখনও যেন হারিয়ে যাসনি।'

যাবে না, দশের ভিড়ে হারিয়ে অবনী যাবে না। বাবার প্ল্যান-করা ভবিষ্যৎ নয়, নিজের ভবিষ্যৎ নিজেই তৈরি করে নেবে। প্রমাণ করে দেবে নিজের চেষ্টায় বড় হয়ে ওঠার ক্ষমতা শুধু হারানের ছিল না, মেজকারও আছে, প্রত্যেক মানুষের থাকে। থাকা উচিত। বাবা জন্মদাতা হলেও কোন অধিকার নেই তার জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার।

প্রাণপণে ভগবানের কাছে অবনী প্রার্থনা করেছে, তিনতলার ঘরে গিয়ে রাধাকৃষ্ণের পায়ের কাছে মিনিটের পর মিনিট উপুড় হয়ে থেকেছে: ভগবান, যতদিন না আমি বড় হয়ে উঠি প্রত্যেক পরীক্ষার আগে আমায় কঠিন অসুখ দাও। এমন ভীষণ অসুখ যে আমি যেন পরীক্ষাই দিতে না

পারি। বাবা তাহলে দুঃখ পাবেন? পান। আমি তো তাই চাই। বাবার বড্ড অহঙ্কার। মনের মত জামাই এনেছেন, লেখাপড়া না হলেও কারখানার কাজে বড় ছেলের চমৎকার মাথা, মেজ ছেলে ক্লাসের ফার্স্ট বয়, ছোট ছেলে যেমন লেখাপড়া তেমনি খেলাধুলো দুয়েতেই চৌকোশ। কারখানা নিয়ে বাবার অহঙ্কার, ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাবার অহঙ্কার—আমি পালিয়ে গেলে বাবার অহঙ্কার চুরমার হবে, এখনি তাতে ফাটল ধরুক। আমি দেখি। চোখ ভরে দেখি। ভগবান!

ভগবান অবনীর প্রার্থনায় কান দেননি : বাংলায় লেটার পেয়ে অবনী পাশ করেছে।

রাখালদা যেদিন খবর আনল, বাড়িতে আনন্দের বান ডাকল। দাদা 'সাবাস!' বলে পিঠে কিল মারল, ছোটকাটা ফাজিলের মত এসে শেকহ্যাণ্ড করল, মা বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

বাবা শুধু হাসলেন : তাঁর ছেলে এমন রেজাল্ট করবে এ তো জানা কথা!

মা বললেন, 'এই ছ্যাখ! ঠাকুর প্রণাম করে এলিনে! যা যা। তাঁর দয়াতেই তো সব।'

অবনীও ভাবছিল। ঠাকুর প্রণামের কথাই ভাবছিল বটে।

তিনতলায় গেল।

পিশিমা পুজোয় না বসলে হয়ত এক লাথিতেই সোনার সিংহাসন সমেত রাধাকৃষ্ণকে ছরকুটে দিত।

নিঃশব্দে কিছুক্ষণ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকল। ঠাকুরকে জিভ দেখাল, মুখ ভেঙাল। তারপর প্রথমে ডান-পা পরে বাঁ-পা তুলে লাথি দেখাল।

মনে মনে চিৎকার করে বলল, ঠাকুর! হে রাধাঠাকুর! হে কৃষ্ণঠাকুর! তোমাদের আমি লাথি মারি। লাথি মারি! লাথি মারি। তোমাদের আমি জোড়া পায়ের লাথি মারি।

অবনী বেড স্যুইচ টিপে আলো জ্বালায়। জ্বালিয়েই নেভায় : নতুন করে দেখার কী আছে!

লুঙ্গিটা কোমরে গুটিয়ে এনে কাটা হাঁটু দুটি আড়াআড়িভাবে মোড়ে।

ভগবান আছেন। হাঁটুতে অবনী সস্নেহে হাত বুলোয়: ভগবান তার প্রার্থনা শুনেছিলেন। বছর চারেক পরে হলেও সে-প্রার্থনা পূর্ণ করেছিলেন।

মশারির ভেতর থেকে দরজার দিকে তাকায় অবনী: দরজার মাথায় ছবির ফ্রেমে বাঁধাই অন্ধকারে ঝাপসা ওই যে তেলরঙ মুখখানা—ওটা বাবার। কুড়ি বছর ধরে ওটাকে ওইখানে দেখে আসছে। বাবার মৃত্যুদিনে প্রীতি ওতে মালা পরায়। অবনী কবে বলেছিল প্রীতি এখনও ভোলেনি। আগে প্রায়ই অবনী ওই ছবির দিকে মিনিটের পর মিনিট চেয়ে থাকত। তারপর অনেকদিন তাকাতে ভুলে ছিল। হেমন্ত চলে যাবার পর আজ চেয়েছিল। আশা করেছিল বাবার থমথমে মুখখানা আজ হাসিতে ভরে উঠবে, চোখ দুটি চিক চিক করবে? অনেকক্ষণ চেয়ে থাকতে থাকতে সত্যিই যেন শেষ পর্যন্ত বাবার ঠোঁট দুটি নড়তে শুরু করেছিল। অবনী সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজে ফেলে। ভয়ে? না, ভয়ে নয়। চোখ বুজে উৎকণ্ঠ হয়ে বাবার মুখখানা আরও ভালো করে দেখতে, বাবার কথাগুলি শুনতে চেয়েছিল।

বৌদি সে-সময় খাবার নিয়ে এসে সব বানচাল করে দেয়।

প্রায় চার বছর পরে ভগবান তার প্রার্থনা শুনেছিলেন। উনিশ শো উনচল্লিশের চোদ্দই জানুয়ারি।

হয়ত এই চার বছর দেরি করার প্রয়োজন ছিল। অবনীর কিশোর মনের সাধস্বপ্নের ছেলেমানুষিগুলি ভাঙার জন্যে প্রয়োজন ছিল। প্রয়োজন ছিল মার মৃত্যু হওয়ার, কারখানায় স্ট্রাইক হওয়ার, গুলি চলার।

অনেক দিন পরে আজ যেমন বাবাকে মনে পড়ছে তেমনি মনে পড়ছে সেই চোদ্দই জানুয়ারির কথা।

শেষের দিকে বাবা পাশে বসে গায়ে হাত রেখে মুখের কাছে মুখ নামিয়ে এনে কথা বলতেন। বাবার পায়োরিয়া ছিল। বাবার কথা ভাবলেই পায়োরিয়ার বোটকা গন্ধ নাকে লাগে।

চৌদ্দই জানুয়ারির কথা ভাবলেও ঝাঁঝালো একটা গন্ধ নাকে এসে ঝাঁপটা মারে।

অচেনা পরিবেশে চোখ মেলে তাকিয়েই সে মাকে ডেকেছিল। সঙ্গে সঙ্গে তার ওপর ঝুঁকে পড়েছিল চারটি মুখ—দুটি ডাক্তারের, একটি নার্সের, একটি এক বৃদ্ধের। বৃদ্ধই। কদিনেই বাবার বয়েস যেন দ্বিগুণ হয়ে গেছে। গাল-বসা, চোখের কোণে কালি, কপালের চামড়া কোঁচকানো, মাথার চুল শনের মত শাদা। গমগমে সেই গলার আওয়াজ পর্যন্ত খড়খড়ে হয়ে উঠেছে।

'বাবা! বাপা আমার!' বলতে বলতে ছেলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলেন অক্ষয়, দুই ডাক্তার তাকে টেনে তোলে।

নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরেছেন, ফোঁপাচ্ছেন, দুই চোখ ফেটে অবিরল জল ঝরছে, থেকে থেকে হিক্কা উঠছে—এই আমার বাবা তো? অবনী বিমূঢ়। অক্ষয় চাটুয্যের এ-রূপ কি কল্পনাও করা যায়? স্ত্রী মারা যেতেও যে-মানুষ এক ফোঁটা চোখের জল ফেলেনি—সে এখন হাপুস নয়নে কাঁদছে?

নিঃশব্দে কাঁদছিল সবাই—দাদা, দিদি, ছোটকা। রাখালদারও চোখ ছলছল করছিল।

'আমার কী হয়েছে?'

'তোর কিছু হয়নি বাবা! কিচ্ছু হয়নি! কিচ্ছু হয়নি! তোর কিছু হতে আমি দেবনারে!' আর্ত চিৎকার করে ওঠেন অক্ষয়।

তাড়াতাড়ি রাখালদা তাকে বাইরে নিয়ে যায়। ছোটকা শব্দ করে কেঁদে ওঠে, নার্স তাকে থামায়। দিদি মুখে আঁচল গোঁজে। দাদা ঘন ঘন রুমালেমুখ মোছে। তাই দেখে, মুহূর্তে ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে অবনীও কেঁদে ওঠে। অবনীর কান্নায় যেন ওদের সংযমের বাঁধ ভেঙে যায়। একসাথে কাঁদতে শুরু করে দেয় সবাই।

'নাঃ, আপনাদের অ্যালাও করাই ভুল হয়েছে। আসুন, চলে আসুন—' ছোটকা, দাদা, দিদিকে নিয়ে দুই ডাক্তার বেরিয়ে যান। ঘরে শুধু নার্স। নার্স তো নয়, জ্যান্ত একটা ডল পুতুল। নির্বিকার। দম-দেওয়া মেশিনের মত সে নিজের কাজ করে চলেছে।

'সিস্টার!'

নার্স ইশারায় কথা বলতে মানা করে।

'আমার কি ছুটো পা-ই ?'

'প্লিজ !' নার্স মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

প্লিজ ! কোমরের নিচে থেকে সাড় নেই, হাঁটুর পরেই চাদরটা বিছানার সঙ্গে মিশে গেছে—আর এমন জলজ্যান্ত ঘটনাকে ও প্লিজ বলে চাপা দিতে চায় ?

'সিস্টার !'

সিস্টার চমকে ওঠে। ডাক্তার ছুটে এসে ঘরে ঢোকে।

নিজের গলার আওয়াজে অবনীর নিজের কানেই যেন তালা লাগে। চোখে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে: সত্যিই তবে সে বিকলাঙ্গ হয়ে গেল ? জন্মের মত সে—

'বাবা !'

—

সেদিন বাবাকে ডেকেছিল—কেন ? অবনীর মন কি বুঝতে পেরেছিল যে বাবাই তার এখন একমাত্র আপন জন ?

দাদা যথারীতি কারখানায় যায়, ছোটকার পরীক্ষা আসন্ন, সে তার পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত, দিদি শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে—চব্বিশ ঘণ্টা অক্ষয় ছেলের পাশে বসে থাকেন। নিজের হাতে অবনীর সব কিছু করেন। দিদির ছেলেটা একদিন অবনীকে দেখে ভয় পেয়েছিল—সেই থেকে অবনীর ঘরে বাইরের লোকের প্রবেশ নিষেধ।

থার্ড ক্লাসে অবনীর একবার টাইফয়েড হয়েছিল। মা তার সেবা-শুশ্রূষা করতেন। বাবা নার্স রাখতে চেয়েছিলেন, মা দেননি। সারা দিন তিনি অবনীর কাছে থাকতেন। রাত দশটা পর্যন্ত। মা তার ঘরে কোনদিন রাত কাটাননি। এমন-কি তার যখন খুব বাড়াবাড়ি গেছে, তখনও। অবনী পরে খোঁজ নিয়েছে—তখন পিসিমা থাকতেন, দিদি থাকত।

সে কথা অবনী ভোলেনি। ওই একটি কারণে মার সমস্ত সেবাযত্ন তার কাছে মিথ্যে হয়ে গিয়েছিল।

মা আজ নেই বলেই কি বাবা রাতেও এ-ঘরে শোয়ার ব্যবস্থা করেছেন ?

নাকি কারখানায় যাওয়া বন্ধ করেছেন বলেই অবনীকে নিয়ে পড়েছেন? প্রভাবতী কটন মিলের প্ল্যানটা বাতিল করতে হওয়ায় বিকলাঙ্গ অবনীকে নিয়ে নতুন কোন প্ল্যান আঁটছেন?

অবনী বাবার চোখে চোখে তাকায়: আমায় না বিলেত পাঠাবে? ব্যারিস্টার করবে?

বাপকে জব্দ করার জন্তে অবনী নিজেই যেন গাড়ি থেকে নেমে রাস্তা পেরোবার সময় ট্রামের তলায় দুই পা ঢুকিয়ে দিয়েছিল।

'তোমায় একটা কথা বলি বাবা। তুমি বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছ। চাণক্য পণ্ডিত বলে গিয়েছেন সন্তান ষোড়শবর্ষীয় হলে—'

সভায় বক্তৃতা দেবার সময় বাবা এই ভাষায় কথা বলেন। রাখালদার লেখা বক্তৃতা মুখস্থ করে। ইশকুলের প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনে অবনী শুনেছে। তাই নিয়ে সবাই হাসাহাসি করলে চটেছে, কিন্তু একা একা নিজেও আবার হেসেছে।

বাবা কি এখন বক্তৃতা দিতে চান? অনেকদিন সভা-সমিতিতে না যাওয়ায় পুরনো অভ্যেসটা সুড়সুড়ি দিয়ে উঠেছে? বিছানা ছেড়ে অবনীর নড়ার ক্ষমতা নেই বুঝে মওকা পেয়ে গেছেন?

'আমার কথায় কিছু মনে কোরো না। লজ্জিত হয়ো না—'

লজ্জিত হয়ো না? সেরেছে! অবনীর তবে লজ্জিত হওয়ার কারণ আছে?

'বিকারের ঝোঁকে মানুষ অনেক কিছু বলে। বিকারের ঝোঁকে, উত্তেজনার বশে। তা নিয়ে কেউ ভাবে না। কিন্তু—।' অক্ষয় থামলেন। চশমা খুলে ফতুয়ার খুঁটে মুছতে লাগলেন।

অবনীর হঠাৎ মনে পড়ে যায় হেমন্তর কথা। নার্সিং হোম ছাড়ার দিন হেমন্তও বিকারের কথা তুলে কী যেন বলতে গিয়েছিল, বাবাকে ঘরে ঢুকতে দেখে থেমে যায়। বিকারের ঘোরে কী বলেছে অবনী?

'এর আগেও একবার—তোমার যেবার টাইফয়েড হয়েছিল—আমি অবশ্য তোমার গর্ভধারিণীর মুখে শুনেছিলাম—।' অক্ষয় দরজার দিকে তাকালেন,

দরজায় চোখ রেখে গলা নামিয়ে বললেন, 'বিকারের ঘোরে বা উত্তেজনার বশে মানুষ কোন্ কথা বলে? না, এমনিতে যেকথা মুখ ফুটে বলতে পারে না—কেমন কিনা?'

তোমার গর্ভধারিণীর মুখে শুনেছিলাম! সেই কথা কি অবনীর মনের গোপনে এতদিন বাসা বেঁধে ছিল? মরা মার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে যে আথালিপাথালি করে কেঁদেছিল, নিজের সমস্ত অপরাধের জন্যে মাপ চেয়েছিল—সে সবই তাহলে মিথ্যে?

'তোমরা একালের ছেলে। একালের চোখ দিয়ে তোমরা সবকিছু দেখবে, তার বিচার করবে—তাই স্বাভাবিক। আমরা যেমন সেকেলে চোখ দিয়ে সবকিছু দেখি, তার বিচার করি। কিন্তু ভুল হয় কখন জানো, বাবা? যখন আমরা আমাদের চোখ দিয়ে তোমাদের বিচার করি, তোমরা তোমাদের চোখ দিয়ে আমাদের বিচার করো। আমার কথা শুনছ তো, বাবা?'

'ওসব কথা এখন থাক, বাবা।'

'থাক তবে।'

অক্ষয় কিছুক্ষণ থম ধরে থাকেন। তারপর বলেন, 'অথচ এই ভুল আমরা সবাই করি, চিরকাল করে যাব। এই হয়ত নিয়তির বিধান।'

নিয়তি! বাবা নিয়তির দোহাই দিচ্ছেন! বাবা না বলতেন, অপদার্থরাই শুধু নিয়তির দোহাই দেয়? নিয়তির তোয়াক্কা পুরুষ মানুষে করে না। করা উচিত নয়। দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদায়ত্তং তু পৌরুষম শ্লোকটা না বাবা প্রত্যেক সভায় বলতেন? রাখালদার বক্তৃতায় লেখা থাকুক চাই না থাকুক। বক্তৃতার শুরুতে এই শ্লোক, শেষে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বাণী। যার জন্যে কেউ কেউ ঠাট্টা করে বলত আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের শিষ্য আশ্চর্য অক্ষয়কুমার।

'বাবা', অক্ষয় উঠে দাঁড়ান, ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে থাকেন,' স্নেহ প্রেম দয়া মায়া খুব মহৎ প্রবৃত্তি, প্রত্যেক মানুষের থাকা উচিত। কিন্তু খাদ্য না পেলে আর সবকিছুর মত ওগুলোও বাঁচে না। জানো, আমি আমার মায়ের একমাত্র সন্তান ছিলাম, আদর্শ মায়ের মতই আমার মা আমাকে ভালোবাসতেন, কিন্তু তিনি আমায় লেখাপড়া শেখাতে পারেন নি, কোনদিন

পেট ভরে খেতে দিতে পারেন নি, জামা কাপড় চেয়েচিন্তে এনে আমায় পরতে দিয়েছেন, রোজ রাতে মা আমায় বুকে করে শুতেন, খিদের জ্বালায় আমি কাঁদলে উনি চুমো খেয়ে আদর করে আমায় সান্ত্বনা দিতেন।'

'বাবা!'

'কিন্তু দেশে কি তখন খাদ্য ছিল না? আমার সমবয়সীদের দেখতাম—আর ঈর্ষায় আমার বুক জ্বলে যেত। ভগবানের কাছে নালিশ জানাতাম—কেন আমাদের এত দুঃখ এত কষ্ট! আমার মা সারাদিন পরিশ্রম করেন, আমি করি তবু কেন—'

'বাবা!'

'ভগবান যেন আমাদের দুর্দশায় ধন্দ দেখেছে। তুমি কি জানো, আবার মা বিনা ওষুধে বিনা পথ্যে মরেছে? মরার পর তার সদ্গতি করার সামর্থ্যটুকুও আমার ছিল না? তাই আমি মার মড়া ফেলে পালিয়ে গিয়েছিলাম।'

'জানি বাবা।'

'জানো? জানবে বইকি। জানা উচিত। আমার কথা প্রত্যেকের জানা দরকার। আমার জীবনী পড়া উচিত। অক্ষয় কাছে এসে দাঁড়ালেন, 'তবে নিশ্চয় এও বোঝ ছেলেমেয়ের প্রতি মা বাবার যেমন কর্তব্য আছে, তেমনি মা-বাবার পরস্পরের প্রতিও কর্তব্য আছে? প্রত্যেক মানুষের জীবন অনেকগুলি কর্তব্যের সমষ্টি। একেকটি কর্তব্য একেকটি জীবন। কাজের জীবন, সামাজিক জীবন, সাংসারিক জীবন, দাম্পত্য জীবন—এর কোনটিই বাদ দেওয়া যায় না। প্রত্যেক জীবনেরই কতকগুলি চাহিদা আছে, সে চাহিদা মেটানোর নামই বেঁচে থাকা। এই দুনিয়ায় বাঁচার ক্ষমতা সকলের নেই। অধিকারও নেই। কিন্তু যার আছে—সে কেন বাঁচবে না? জীবনের চাহিদা ষোল আনা মিটিয়ে নিজের দাবিও কেন কড়ায় গণ্ডায় আদায় করে নেবে না?'

চাহিদা! দাবি! দশ বছরের সেই স্মৃতি! বিকারের ঝোঁকে বলা কথা!

কিন্তু আজকের বিশ বছরের অবনীর মনেও সেই দশ বছরের স্মৃতি অটুট থাকে কী করে? গত দশ বছরে কি অবনী অনেক বদলায়নি, অনেক কিছু

জানেনি? শোনেনি? দেখেনি? নরনারীর দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে তার ধারণাটা কি পাল্টে যায় নি?

মানুষকে বিচার করবি দিনের আলোয়, রাতের অন্ধকারে নয়—হেমন্তর এই কথাটি যে কতখানি সত্য, বোঝেনি?

বাবাকে দেখে অবনীর মায়া হয়, অনুকম্পা জাগে: ক্ষণজন্মা পুরুষ অক্ষয় চাটুয্যে ছেলের কাছে আজ কৈফিয়ত দিচ্ছেন!

'জানিস মেজকা, বাবা কারখানা বেচে দিচ্ছেন।' দস্তুরমত উত্তেজিত হয়ে দাদা ঘরে ঢোকে।

'কারখানা বেচে দিচ্ছেন?' খবরটা অবাক হওয়ারই মত। 'কেন?'

'কারখানায় গুলি চলার পর থেকেই কারখানায় যাওয়া কমিয়ে দিয়েছিলেন, আমি ভাবলাম, বয়েস হয়েছে—বোধহয় রিটায়ার করলেন, তারপর তোর এই অবস্থা—তোকে নিয়েই এখন থাকবেন। তা নয়, তলে তলে অন্য মতলব আঁটছিলেন।'

'কারখানায় নাকি আবার গোলমাল হচ্ছে—'

'হচ্ছে, হবে। কারখানা চালাতে গেলে, কুলী মজুরদের নিয়ে কাজ করতে হলে গোলমাল হয়ই। পাছালদের কারখানা আজ বাইশ দিন বন্ধ, কই ওরা তো তাই বলে কারখানা বেচছে না। বাবা তোকে কিছু বলেন নি?'

'না তো!'

'অথচ সব্বাইকে বলে বেড়াচ্ছেন, আমি নাকি কারখানা চালাবার যোগ্য নই, ম্যানেজারবাবু নাকি একটা অমানুষ। আমাদের জন্যেই নাকি বারবার কারখানায় হাঙ্গামা বাধছে।'

'তা বাবাই যখন কারখানার মালিক—'

'মালিক বলেই যা-ইচ্ছে করার রাইট নেই। ছেলেকে বাপই জন্ম দেয়, তা বলে ছেলেকে খুন করতে পারে?'

অবনীর হাসি পায়: তার কথাটা বড়দা হুবহু মনে রেখেছে তো? 'তা বটে।'

'তাও আগরওলাকে বেচলে কথা ছিল, সে বেশি দাম দিত, এখনকার পুরো স্টাফকে রাখত, কিন্তু আগরওলা যে মেড়ো! কোত্থেকে এক বাঙালকে জুটিয়েছে—'

'বেশ তো. এ কারখানা যায় যাক। তুমি কাজকর্ম জানো, নিজে নতুন কারখানা খোল—'

'তবে আর বলছি কি। সে-গুড়েও বালি। কারখানা বেচা টাকা দিয়ে ঠাকুমার নামে হাসপাতাল হবে, মার নামে মেয়ে-ইশকুল হবে, পুরনো মজুররা তিন মাসের মাইনে বকশিশ পাবে—আর আমরা যেন বানের জলে ভেসে এসেছি। আমার প্রতি, তোর প্রতি, ছোটকার প্রতি বাবার কোন কর্তব্য নেই? হুট করে যে একটা মেয়ে এনে আমার গলায় ঝুলিয়ে দিল—তার প্রতিও কোন দায়িত্ব নেই? এই যদি বাবার মতলব ছিল, কেন আমায় এখন বিয়ে দিল?'

'বেশ তো আমি বাবাকে বলব।'

'বলাবলি নয়। বলে কোন ফল হবে না। উনি যখন জিদ ধরেছেন, সহজ পথে ওকে ফেরানো যাবে না। বাঁকা পথ ধরতে হবে। নইলে আমরা মরেছি!'

কথাটা ভাববার মত। দু পা হারিয়ে ব্যারিস্টার হওয়ার হাত থেকে বেঁচে গেছে বলে অবনী কদিন আগেই হেমন্তর কাছে খুশি প্রকাশ করেছে, বছর চারেক পরে হলেও তার প্রার্থনা শুনেছেন বলে ভগবানকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে—দাদার কথায় এখন তার টনক নড়ে। ইদানীং রোজ দু তিনটি করে কবিতা লিখছে। সব সময় স্বপ্ন দেখছে, স্বপ্নের পাখায় উড়ে চলেছে। কিন্তু মাথা গোঁজার একটা আস্তানা আর দুবেলা দুমুঠো অন্নের সংস্থান যদি না থাকে, বিকলাঙ্গ অবনীমোহনের সব স্বপ্নই যে তাহলে শিকেয় উঠবে। অত বড় আদর্শবাদী হেমন্ত, কিন্তু টাকা টাকা করে কীভাবে ওর পড়াশোনা চুলোয় গেছে, সংসার নিয়ে বেচারি হিমশিম খাচ্ছে—দেখছে তো চোখের সামনে। হেমন্ত অনাদি আর কিছু না পারুক মুটেগিরি করেও খেতে প্যারে, কিন্তু অবনী?

'এখন একমাত্র উপায়,' চাপা স্বরে অনাদি বলে, 'বাবাকে পাগল প্রতিপন্ন করে—'

'বড়দা !'

'উপায় নেই মেজকা ! এ ছাড়া আমাদের বাঁচার উপায় নেই !'

মানুষ বাঁচতে চায়।

বাঁচার জন্যে মানুষ সবকিছু করে।

বাঁচার জন্যে বাবাকে পাগল প্রমাণ করতে চায়। বছরের পর বছর আহাম্মক সেজে থাকে। প্রেমের অভিনয় করে। বন্ধুকে ধাপ্পা দেয়।

বাবা বলতেন : দুনিয়ায় বাঁচার ক্ষমতা সকলের নেই।

আর আজ হেমন্ত বলল, 'কেন বাঁচবে না মানুষ। আলবৎ বাঁচবে।' যেমন করে হোক বাঁচবে।'

'তুই কি বলতে চাস—'

'বলতে চাই, বড়দার নিজের প্রয়োজনে যেমন বাবাকে কোণঠাসা করার প্রয়োজন ছিল, তেমনি তোরও প্রয়োজন ছিল বাহির দুয়ারে কপাট এঁটে ভিতর দুয়ার খুলে দেওয়ার। আর প্রেম! একজন আরেকজনের প্রেমে পড়ে যায় অম্নি অম্নি? নীহারটা নেহাতই আহাম্মক, তাই আজই ওই চিঠি পাঠিয়ে বসেছে। কিন্তু তোর বৌদি—'

'হেমন্ত!'

হেমন্ত ঠা ঠা করে হেসে উঠেছিল।

বাঁচাটা মানুষের এত দরকারী? সকলের বাঁচা? সংসারে যার কোন প্রয়োজন নেই তার বাঁচাও?

বাঁচা! কতভাবেই না মানুষ বেঁচে থাকে! মরার বেহদ্দ হয়েও বেঁচে থাকে।

সত্যিকারের বাঁচা কাকে বলে দেখিয়ে দিয়ে গেল অক্ষয় চাটুয্যে: কারখানা বিক্রি করল। ইশকুলে, হাসপাতালে টাকা দিল। পুরনো চাকর বাকর আত্মীয়স্বজনদের দুচার-হাজার দিয়ে বিদেয় করল। শিবপুরের বাড়ি বেচে দিয়ে বরানগরে এই বাগানবাড়ি কিনল। তিন ছেলে আর ছেলের বউকে নিয়ে এখানে উঠে এল।

এবং, বছর খানেকের মধ্যে এতগুলি ঘটনা ঘটিয়ে আত্মহত্যা করল।

আত্মহত্যা? একটি মানুষ যদি শান্ত স্বরে বড় ছেলেকে বলে, 'শিশুকাল থেকে সংসারের সাথে লড়াই করে আমায় দাঁড়াতে হয়েছিল, সেই দিক দিয়ে তুমি সৌভাগ্যবান—তুমি সাবালক। এ বাড়ি যদিও আমি মেজকার নামে লিখে দিয়ে গেলাম কিন্তু তুমি যদি ওর ভরণপোষণ কর এখানেই থাকবে। নইলে নিজের মহল বাদ দিয়ে বাকি বাড়ি ভাড়া দিলে মেজকার বেশ চলে যাবে। টাকা দিয়ে স্নেহ প্রেম মায়া মমতা সবই কিনতে পাওয়া যায়। ছোটকার ডাক্তারি পাশ করার টাকা রেখে গেলাম। তবে ও যদি পড়তে না চায় বা ফেল করে—ওই টাকা হাসপাতালে যাবে। ওর দায়িত্ব নিতে তুমি যদি না চাও, ও হস্টেলে থাকবে। এখন যে যার নিজের পায়ে দাঁড়াও, নিজের পথ তৈরি করে নাও—সেটাই সত্যিকারের পুরুষ মানুষের কাজ।' এই রকম একটানা উপদেশ দিয়ে, তিন ছেলে আর ছেলের বউকে থ বানিয়ে রেখে সে যদি ঘরে গিয়ে শোয়, আর খানিক পরে গিয়ে দেখা যায় মরে পড়ে আছে—তাকে আত্মহত্যা বলবে না? ইচ্ছামৃত্যুর আরেক নামই কি আত্মহত্যা নয়?

এ-আত্মহত্যা গৌরবের। অক্ষয় চাটুয্যের মত ক্ষণজন্মা পুরুষই পারে এভাবে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে। যেমন আবির্ভাব, তেমনি তিরোভাব—চন্দ্রকান্তবাবু সাবাসের স্বরে বলেছিলেন। আরও বলেছিলেন, মানুষের কাজ ফুরোলে কী প্রয়োজন বেঁচে থাকার! ঠিকই বলেছিলেন।

অক্ষয় চাটুয্যে আফিম খেয়ে কি কড়িকাঠে ঝুলে কি গায়ে কেরোসিন ঢেলে আত্মহত্যা করেছে—ভাবা যায়? তেমন আত্মহত্যার মড়া অবশ্য দেখেনি অবনী, কিন্তু সে নাকি বড় ভয়ানক বীভৎস দৃশ্য।

হাসপাতাল থেকে ফিরে ছোটকা রোজ মড়ার গল্প করত। কীভাবে পেট চিরে, নাড়িভুড়ি ঘেঁটে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে আত্মহত্যার মড়াগুলি তারা পরীক্ষা করে—ফলাও করে তার গল্প ফাঁদত। শুনতে শুনতে অবনীর মনে পড়ে যেত বাবার কথা। বাবা দেখতে ভালো ছিলেন না। কিন্তু মরার পর মুখখানা তাঁর কী সুন্দর দেখাচ্ছিল! ঘুমোলে বাবার নাক ডাকত, মুখ হাঁ হয়ে থাকত, গোঁফজোড়া খাড়া খাড়া হয়ে উঠত—প্রাণপণ চেষ্টায়

যেন দুহাতে আঁকড়ে ধরেছেন—মনে হত। আর সেদিন মনে হয়েছিল ঘুম এসে তাঁকে কোলে তুলে নিয়েছে। কী অনাবিল প্রশান্তিতে মুখখানা তাঁর মহিমময় হয়ে উঠেছিল।

প্রথম জীবনে বাবাকে অবনী ভয় করেছে, পরে ঘৃণা, তারপরে মায়া, সেই বুঝি প্রথম তার বাবাকে দেখে শ্রদ্ধা হয়েছিল। জীবন্ত বাবার পায়ে মাথা ছুঁইয়েছে বহুবার, সত্যিকারের প্রণাম বুঝি সেই প্রথম করেছিল।

কিন্তু বাবা যদি মামুলীভাবে আত্মহত্যা করতেন? তাহলে বাবার দেহটাকে নিয়েও তো ছোটকারা—

অবনী শিউরে ওঠে। চিৎকার করে বলে, 'বেরো তুই আমার ঘর থেকে। পিশাচ কোথাকার!'

'দাদা, এসব সেন্টিমেণ্টের মানে হয় না। মানুষকে বাঁচাবার জন্যেই তো মড়া কেটে—'

বৌদি বাধা দেয়, 'তোমার মুখে কি ও ছাড়া কথা নেই ছোট-ঠাকুরপো।'

'তুমি বোঝ না বৌদি—'

'বুঝে আমার কাজও নেই। তুমি ভাগো। হাতমুখ ধোও গিয়ে। যা-ও!'

বৌদি একরকম জোর করেই তাকে ঘর থেকে বের করে দিত।

আস্তে আস্তে তার ঘরে আসা-ই কমিয়ে দিয়েছিল ছোটকা। এর পিছনে বৌদির হাত ছিল?

বিয়ের নামে যে ছোটকা এ-বাড়ি ছেড়ে চলে গেল, বিয়ের পর বার দুই-তিন মাত্র বউ নিয়ে এসেছে, ন-মাসে ছ-মাসে সে নিজে এলেও বউকে নিয়ে যে আসে না—সেও কি বৌদির কারসাজি?

বৌদি। প্রীতি। অনাদির স্ত্রী, অবনীর প্রিয়তমা, মানস প্রতিমা। অবনীর সেই বিখ্যাত 'চোখ' কবিতাটি একে নিয়েই লেখা। যদিও চোখ দুটি এর নিতান্তই সাধারণ।

সাধারণ! আজ, এখন মনে হচ্ছে। অথচ এতদিন কম করেও হাজার খানেক চুমো কি আমি ওই চোখে খাইনি?—ঘেন্নায় অবনীর দেহ-মন গুলিয়ে ওঠে, হাতের চেটো দিয়ে অবনী প্রাণপণ ঠোঁট রগড়ায়। এখনো যেন কবিত্বের কেতুর তার ঠোঁটে লেগে আছে।

শুধু ছোটকা বাদে এ ঘরে প্রত্যেকের আসা বন্ধ করেছে প্রীতি। অবনীকে সে সবার থেকে আগলে রেখেছে। প্রথমবার মা হবার সময় হাসপাতালে গিয়েছিল, মাসখানেকের জন্যে তখন এক নার্স রাখা হয়। দ্বিতীয়বার হাস-পাতালে যাবার সময়েও সেই ব্যবস্থা হয়েছিল, কিন্তু হাসপাতাল থেকে ফিরে সাতদিনের মাথায় সেই নার্সকে বিদেয় করে দেয়। তৃতীয়বার হাসপাতালেই যায়নি।

এ কি ভয়ে, না ভালোবাসায়? পাছে অবনীর কাছে কেউ ফাঁস কিছু বলে ফেলে মিথ্যার এই ঘেরাটোপটা ভেঙে দেয় সেই ভয়ে? নাকি অবনীকে সে-ই শুধু ভালোবাসবে বলে? অবনীর সব কিছু চাহিদা সে একাই মেটাবে বলে?

চাহিদা! সে চাহিদা যদি মাত্রা ছাড়ায়, ক্ষতি নেই। ভালোবাসা যে! বাবা বলতেন—

হেমন্ত আজ বলল, 'তুই যদি এই সংসারের গলগ্রহ হতিস, অর্থাৎ এই বাড়ি যদি তোর নামে না থাকত, নিচের তলার ভাড়া বাবদ মাসে যদি দেড়শো করে না মিলত—দেখতাম কে তোকে কত ভালোবাসে। দেখছি তো চারদিকে।'

হেমন্তর কথা শুনে উঠে বসেছিল অবনী। মুখে যা আসে তাই বলেছিল।

এখন বোঝে—অন্যায় তারই। এতদিন হেমন্ত তাকে যত ধাপ্পাই দিয়ে আসুক, আজ অন্তত সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেছে।

বাবা বলতেন, বিকারের ঘোরে উত্তেজনার মাথায় মানুষ তার মনের কথা বলে ফেলে। আজ হাতে হাতে তার প্রমাণ পাওয়া গেল। ভাগ্যিশ হেমন্তকে উত্তেজিত করে দিতে পেরেছিল! এতদিন তার সব কথায় সায় দিয়ে তার সঙ্গে মোসাহেবের মত ব্যবহার করে এলেও তাই-না হেমন্ত আজ রুখে দাঁড়ায়।

শওকতের কত গল্প হেমন্ত এতদিন করেছে: ঢাকায় আছে। ঢাকা রেডিওর বড় চাকরে। পাকিস্তানী কালচারাল মিশন নিয়ে বিদেশ ঘুরে এসেছে। মাঝে মাঝে চিঠিপত্র দেয়। কিছুদিন আগে দমদম এরোড্রোমে দেখা হয়েছিল। করাচী যাচ্ছিল, ভিসা না থাকায় কলকাতায় ঢুকতে পারেনি। নইলে শওকতের খুব ইচ্ছে ছিল অবনীর সঙ্গে একবার দেখা করে

যায়। যতক্ষণ ছিল, অবনীর কথাই শুধু বলেছে। অবনীর কবিতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে। অবনীর মাত্র দুটি কবিতার বই ওর হাতে পড়েছে, তাতেই মুগ্ধ।

'তুই জানিস না অবু, শওকতের কথা যখন তোর কাছে বলছিলাম কেমন করছিল আমার বুকের ভিতরটা। তারপর এখান থেকে গিয়ে আমি নিজের চুল ছিঁড়েছি, নিজেই নিজের মুখে থুতু দিয়েছি। আমি ভণ্ড। আমি একটি হাড়-হারামজাদা! তের বছর আগে কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে, ওয়াই-এম-সি-এর সামনে, আমারই চোখের সামনে পিটিয়ে পিটিয়ে খুন করা হয় শওকতকে। আমি কিছু করিনি, কিছুই করতে পারিনি। ও একবার শুধু 'হেমন্ত!' বলে চিৎকার করে উঠেছিল। দুই চোখ মেলে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল—ওর সেই চিৎকার আজও আমার কানে বাজে অবু, ওর সেই চাউনি—।'

মাখনের কত গল্প হেমন্ত এতদিন করেছে : তাদের সঙ্গে পড়ত মাখন। তার কথার টানের জন্যে সবাই তাকে বাঙাল বলে ক্ষেপাত। মাখন শুধু হাসত। নিজেকে শোধরানো দূরে থাক আরও বেশি করে বাঙাল কথা বলত। বাঙাল বলে বুক ফোলাত। নিজের দেশের জন্যে মাখনের গর্বের অন্ত ছিল না। তাদের গ্রামের মত অমন গ্রাম নাকি সারা পৃথিবীতে নেই। সাধেই কি সে সাতদিনের ছুটিতেও ঢাকা মেলে চেপে বসে।

মাখনের বাবা ছিলেন তালুকদার। দেশ-ভাগাভাগির পর মাখনদের অবশ্য চলে আসতে হয়েছে, কিন্তু এখানে এসেও গুছিয়ে বসেছে। বর্ধমানে বাড়ি করেছে, জায়গাজমি করেছে। হেমন্ত একদিনের জন্যে গিয়ে তিনদিন সেখানে থেকে এসেছে। মাখনের মা-বাবা মাটির মানুষ, মাখনের ভাইবোনেরা হীরের টুকরো। সুখের সংসার।

সুখের সংসার!

তের বছর আগে মাখনের মা-বাবা ভাইবোন আত্মীয়স্বজন মিলিয়ে চৌদ্দ জনকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হয়। কলকাতায় সেই খবর পেয়ে মাখন প্রায় পাগল হয়ে যায়, পেন্সিল-কাটা ছুরি নিয়ে মুসলমান খুন করতে কলুটোলায় গিয়ে ঢোকে—ফিরে আর আসেনি!

'অবু, তুই জানাতস যুদ্ধ হয়েছে, দুর্ভিক্ষ হয়েছে, দাঙ্গা হয়েছে, দেশ ভাগ হয়েছে, আমরা স্বাধীন হয়েছি—এই মাত্র। খবরের কাগজ তুই পড়িস না, বাইরের কারো সঙ্গে তোর যোগাযোগ নেই—তাই তুই ধারণাও করতে পারবি না অবু এই যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ-দাঙ্গার কী মানে? এর ফলে কী ঘটে গেছে আমাদের জীবনে, মনে। তুই আছিস তোর মনগড়া জগৎ নিয়ে। খাওয়া পরার ভাবনা নেই, প্রেমের কবিতা লিখছিস, প্রেম করছিস—তোফা আছিস।'

'খাওয়াপরার ভাবনা তো তোরও নেই। ভালো চাকরি পেয়েছিস—'

'পেয়েছি। নানা জায়গায় ঠোক্কর খেয়ে খেয়ে এতদিনে একটা ভদ্রগোছের চাকরি পেয়েছি। কিন্তু এও এক আশ্চর্য।'

'আশ্চর্য কেন? তোর যোগ্যতা আছে, অভিজ্ঞতা আছে—'

'যোগ্যতা! এফিশিয়েন্সী! অভিজ্ঞতা! এক্সপিরিয়েন্স! এ এক প্রচণ্ড বুজরুকি। আমার সঙ্গে ইণ্টারভিউ দিয়েছিল আরও পাঁচজন। তাদের অন্তত তিনজনের এফিশিয়েন্সি এক্সপিরিয়েন্স আমার চেয়ে কম নয়। আমি প্রথম যখন খবরের কাগজে আসি ওদেরই একজন আমায় কাজ শিখিয়েছিল। কিন্তু—'

'কমপিটিশনের ক্ষেত্রে—'

'কমপিটিশন! মালিকের ব্যাটা মালিক হয়ে বসে সেখানে কমপিটিশনের প্রশ্ন ওঠে না, এফিশিয়েন্সির প্রশ্ন ওঠে না, এক্সপিরিয়েন্সের প্রশ্ন ওঠে না? কমপিটিশন কেবল সাধারণ মানুষের বেলায়, যারা শুধু খেয়েপরে বাঁচতে চায়? কমপিটিশন! ওরা কি আমার কাছে কমপিটিশনে হেরে গেল, না আমার ভালো সোর্স ছিল বলে ওরা খারিজ হয়ে গেল?'

'ভেকেন্সি যখন একটা, ওরা কেউ চাকরিটা পেলে তোর হত না।'

'তাই। গণতান্ত্রিক এই কমপিটিশনে সকলের একসাথে বাঁচার অধিকার নেই—ভেকেন্সি নেই। তবু আমাদের গলা ছেড়ে জীবনের জয়গান গাইতে হবে। বাস্তবে যাই দেখ—বইয়ে-পড়া আর বক্তৃতার-শোনা মহৎ মহৎ মানবিক আদর্শের কাসুন্দি ঘেঁটে যেতেই হবে। যেমন দুর্ভিক্ষের সময় চোখের সামনে দলে দলে মানুষকে না খেয়ে মরতে দেখে, সেই

মড়া ডিঙিয়ে মড়ার গায়ে হোঁচট খেয়ে তোর কাছে এসে লুচি-হালুয়া সন্দেশ রসগোল্লা গিলে কান খাড়া করে তোর প্রেমের কবিতা শুনেছি, তোর সঙ্গে শিল্প-সংস্কৃতির মাহাত্ম্য নিয়ে আলাপচারি করেছি। অহো! মেশিন-গানের সামনে যুই ফুলের গান গাওয়াই না পরম কেরামতি। ঘেন্না হয়, অমু, এই ভণ্ডামি দেখে আমার ঘেন্না হয়। নিজেকেও এই ভণ্ডামি করতে হয় বলে—'

'অথচ আমায় কোনদিন তো—'

'বলিনি তোর বাবাকে কথা দিয়েছিলাম বলে। বলিনি কৃতজ্ঞতার বশে। কৃতজ্ঞতা! তোর বাবার টাকায় আমার মার চিকিৎসা হয়েছিল; বোনছুটোর বিয়ে হয়েছিল যে! সেই মা অবিশ্যি অনেকদিন ফৌত হয়ে গেছে, বোনেদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাতই হয় না—কিন্তু সেই কৃতজ্ঞতার জের আমায় জীবনভর টেনে চলতে হবে। কৃতজ্ঞতা যে মনুষ্যত্বের একটা প্রকাণ্ড তকমা যদিও আমার মনুষ্যত্বকে কুড়ে কুড়ে খেয়েছে আমার কৃতজ্ঞতা। চাকরি করতে করতেও সেটা হাড়ে হাড়ে বুঝেছি, কিন্তু উপায় নেই। অকৃতজ্ঞ হওয়ার চেয়ে নিন্দনীয় আর কী আছে। তাই যে চীফ রিপোর্টারকে ঘৃণা করি কৃতজ্ঞতা বশে তার ছেঁড়া চটিও দাঁতে বইতে হয়। ওরই দয়ায় যে চাকরিটা পেয়েছি।

'তুই আমায় ঘৃণা করিস?'

নিজেকে যে ঘৃণা করে সে কি কাউকে ভালোবাসতে পারে? শুধু তোকে নয়, সবাইকে, বিশ্ব সংসারকে আমি ঘৃণা করি। মানুষের ওপর বিশ্বাস রাখাকে পাপ মনে করি। কেননা আমি যে নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে জানি প্রেম প্রীতি স্নেহ ভালোবাসা মায়া মমতা—এ সবই লোক-ঠকানো তামাশা মাত্র। প্রণব যেদিন মারা গেল—'

'প্রণব বেঁচে নেই?'

'ভূত হয়ে গেছে কবে! মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে টি-বি হলে বাঁচে? প্রণব মরে বেঁচেছে, প্রণবের বোনটা দিনের পর দিন মরে সংসারটাকে বাঁচিয়ে রাখছে।'

'প্রণবের বোনের সঙ্গেই না তারকের—'

'প্রেম ছিল। প্রণবের সঙ্গে যেমন প্রেম ছিল নিভার। যে-নিভা প্রণবের রোগ ধরা পড়তেই সুড়সুড় করে বাপের কথামত বিয়ের পিঁড়িতে গিয়ে বসে।'

'অথচ নিভা ইচ্ছা করলে—'

'পারত না। ব্যক্তিগত ইচ্ছে-অনিচ্ছের কানাকড়ি দামও নেই। প্রবল প্রতিপক্ষের সঙ্গে ইচ্ছের জোরে কতক্ষণ তুমি যুঝবে? আমি কি শওকতকে বাঁচাতে পেরেছিলাম? অথচ ইচ্ছে তো আমারও ছিল। নিভা প্রণবকে বিয়ে করতে পারত, টি-বি রুগীকে বিয়ে করলে সবাই ধন্ত-ধন্ত করত, তার প্রেমের জয়ধ্বনি দিত—কিন্তু তারপর? নিভা চাকরি করে স্বামীর রোগ সারাত? অসম্ভব। তবে হ্যাঁ, স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যেতে পারত। যেমন শওকতের সঙ্গে সঙ্গে আমিও খুন হতে পারতাম। কিন্তু কী লাভ হত? খবরের কাগজের পিঠ-চাপড়ানি মিলত। তারপরে সবাই দিনকয়েক আমার গুণগান করত—তারপর পৃথিবী যেমন চলছিল তেমনি চলত। আর বেশ্যা থাকবে অথচ গনোরিয়া-সিফিলিস থাকবে না—হয় না। এই সমাজ থাকলে যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ দাঙ্গা থাকতে বাধ্য। স্বাধীন ভারতে স্ত্রী ও তিন ছেলেকে খুন করে অ্যাসিড খেয়ে মরেছে সুকুমার—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাদের সেই তোতলা সুকুমার—তারও কি বাঁচার ইচ্ছে ছিল না রে? ফুটপাথে ছেলেকে আছড়ে খুন করল যে-লোকটা সে-ও কি বাঁচতে চায়নি? কমপিটিশন অবু, এরই নাম কমপিটিশন। এই কমপিটিশনের দৌলতেই যুদ্ধের বাজারে চালের কারবারে লাল হয়ে তারক আজ কেউ-কেটা। প্রণবের বোনকে নিজের ঘরে নিয়ে না তুললে কি হবে, ঘরের বার তাকে তারকই করেছে।'

'আর এই তারকই—'

'ছিল। আগুনের টুকরো ছিল—অতীতে। আর তারকেরই বা কী দোষ। কমপিটিশনে না জিতলে তারককেও মুখ থুবড়ে পড়তে হত।'

কেবলি বাবার কথা মনে পড়ছে অবনীর। বাবার মুখখানি চোখে ভাসছে। বাবার কথাগুলি কানে বাজছে।

যে-কথাগুলি বাবা বলতে শুরু করেছিলেন, শেষ করে যেতে পারেন নি—হেমন্ত কি আজ তারই প্রতিধ্বনি করেছে? অক্ষয় চাটুয্যে যেটা সবে বুঝতে শুরু করেছিলেন হেমন্ত সেই সম্পর্কে পুরো ওকিবহাল হয়ে গেছে বলে?

অক্ষয় চাটুয্যে সত্যিই বীর নায়ক। নিজের হাতে যেমন গড়েছিলেন, নিজের হাতে ভেঙে দিয়েছেন। এরই নাম পুরুষকার।

যথাসাধ্য কর্তব্য করে যাওয়াই মানুষের ধর্ম। কর্তব্য শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রয়োজনও ফুরিয়ে যায়। তখন সে সংসারের গলগ্রহ।

অবনী তার চল্লিশ বছরের জীবনে কোন কর্তব্যটা করেছে? অজস্র কবিতা লিখেছে। মাসিকে সাপ্তাহিকে কিছু কিছু কবিতা ছাপা হয়েছে। চারটি কবিতার বই বেরিয়েছে।

কী ভাবে কবিতা ছাপা হয়েছে? কবিতার বই বেরিয়েছে?

প্রীতির গয়না বেচা টাকায়।

এ ছাড়া নাকি উপায় ছিল না। কেননা অবনীর কবিতা পড়ার মত মন-মেজাজ নেই আজকের পাঠকের।

'ছেলেবেলায় থিয়েটার দেখেছিস তো? ঐতিহাসিক বই, পৌরাণিক বই, সামাজিক বই—বীররস, করুণরস, হাস্যরস, মধুররস—সর্বরসের ছড়াছড়ি দেখতে দেখতে আমরা হাসি, কাঁদি, আবেগে দিশেহারা হয়ে এংকোর দিয়ে উঠি। অভিনেতাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাই। কিন্তু সে কয়েক ঘণ্টার জন্যে—'

'তুই কি বলতে চাস—'

'যা ভাবছিস, তাই। তোর কবিতা শুনতে শুনতে আমি অনেক সময় থিয়েটারের ওই দর্শকের মতই এংকোর দিয়েছি। শুধু তোর কবিতা কেন, তোর গুরুদেব রবীন্দ্রনাথকে যে বাহবা দিই আসলে তাও ঐ এংকোর।'

'মহৎকে গ্রহণ করার ধারণ করার ক্ষমতা তোর নেই। তাই তুই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এই কথা বলতে পারলি।'

'স্বীকার করছি আমার নেই। নেই কারণ, নরকে নিশ্বাস নিয়ে স্বর্গীয় সুষমার তারিফ করা অসম্ভব। তোর আছে, কারণ নরকেও তুই বাস

করিস এয়ার-কন্‌ডিশন্‌ড্‌ কুঠুরিতে। কিন্তু আর সবাই? এ যুগে বাস করেও রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করার ধারণ করার ক্ষমতা তারা টিকিয়ে রাখে কী করে? হয় তারা অন্ধ-আহাম্মক, নয় ভণ্ড বদমাইস রবীন্দ্রভক্তদের দেখে আমার মনে পড়ে থিয়েটারের সেই বনেদী পেট্রনদের—দশ আঙুলে আটটি আংটি, গলায় হার, গিলে-করা পাঞ্জাবি আর বাহান্ন ইঞ্চি ফিতে-পাড় ধুতি পরে বক্সে বসে থিয়েটার দেখে, সীতার দুঃখে কেঁদে ভাসায়, পরে গ্রীনরুমে গিয়ে খোঁজ নেয় তার রেট কত—খুচরো এবং বাঁধা। কিম্বা সিনেমার সেই হাঘরে দর্শকদের—ঘণ্টা দুয়েকের জন্যে সংসার থেকে পালাবার আশায় যারা সিনেমায় গিয়ে ঢোকে।'

অথচ অবনীর কাছে নিজের অস্তিত্বের মতই তার কবিতার অস্তিত্ব জীবন্ত ছিল।

অবিকল সেই স্লেটের ছবির মত।

বড় হয়ে অবনী তার সাত বছরের শোকের জন্যে হেসেছিল: স্লেটের ছবি মুছে যায়, যাবেই।

স্লেটের ছবি! অবনী কল্পনা করে, সাত বছরের মনে চল্লিশ বছর ভর করেছে, স্লেটের ছবি মুছে যাওয়ায় আকুল স্বরে কেঁদে ওঠা দূরে থাক—স্লেটটা দু হাত শূন্যে তুলে আছাড় মারল—স্লেট চৌচির হল, আর গলা ফাটিয়ে ঠা ঠা করে সে হেসে উঠল। তার হাসি শুনে ছুটে এল সবাই। কিন্তু না, আজ কাউকে ঠাট্টা করার সুযোগ দেয়নি অবনী, সহানুভূতি জানানোর সুযোগ দেয়নি—অবনীকে দেখে সবাই আজ অবাক।

অবনী যে বাহাদুর। জন্মসূত্রে বাহাদুর। বাহাদুর কা ব্যাটা বাহাদুর।

মশারির মধ্যে বিছানায় জোড়াসন হয়ে বসে অবনী—সামনে জলভর্তি গামলা—ঠুটো দুই পায়ের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে প্রাণপণে দাঁত বের করে। তার সামনে যেন মস্ত একটা আয়না, আয়নায় নিজেকে দেখিয়ে দেখিয়ে হাসে, হরেক হাসির মহড়া দেয়।

হাসির চোটে বত্রিশপাটি দাঁত বেরিয়ে পড়ছে না মনে হওয়ায় দুই

হাতের দুই তর্জনীকে আংটা করে দুই কস দুপাশে টেনে ধরে, চিরে ফেলতে চায়।

কিন্তু না, এ হাসিতে ব্যথা লাগে। আহা, অবনীমোহন কি ব্যথা সইতে পারে! আদর করতে গিয়ে তার কপালে একদিন চুড়ির খোঁচা দিয়ে ফেলেছিল প্রীতি, সঙ্গে সঙ্গে কি 'আহা লাগল? ষট! ষট!' করে কপালটা তার বুকের সঙ্গে চেপে ধরেনি?

কে জানে, চুড়ির খোঁচাটা অজুহাত কিনা।

নইলে ওভাবে চেপে না ধরলে, কিছুক্ষণ ধরে না থাকলে, কি অবনী টের পেত যে প্রীতিও তাকে ভালোবাসে? প্রীতির ভালোবাসা আগে না টের পেলে কি অবনী তার মনের কথাটা মুখ ফুটে বলার জন্যে প্রীতির কোমর জড়িয়ে ধরার সাহস পেত?

আহা, অবনীমোহন ভালোবেসেছিল! ভালোবাসা পেয়েছিল!

হেমন্ত ভালোবেসে বিয়ে করে আট বছরেও বউ নিয়ে সংসার পাতার সাহস না পেলে কি হবে, মৃগাঙ্কর অত ভালোবাসার বিয়ে দু বছরেই খারিজ হয়ে গেলে কি হবে, একটা বাচ্চা বিয়োতেই ভালোবেসে-বিয়ে-করা বউয়ের বদলে বাজারে মেয়েমানুষই সরোজের কাছে বেশি মজাদার মনে হলে কি হবে—অবনীর ভালোবাসা নিকলুষ নির্ভেজাল। এ ভালোবাসা জন্মজন্মান্তরের। তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি শতরূপে শতবার—

সত্য! সত্যকাম। সত্যকামকে একবার দেখতে ইচ্ছে করছে। কলিং বেল টিপে ডাকবে প্রীতিকে? বলবে, সিঁথিতে দগদগে সিন্দুর পরে, শাড়ির আঁচল মাথায় তুলে, সত্যকামের মুখটা স্তনে গুঁজে দিয়ে ঠিক সেদিনের মত আজও একবার দাঁড়াও আমার আঁখির আগে?

সম্ভব না। দশ বছরের মোটাসোটা ছেলেটাকে কাঁকালে নিয়ে ম্যাডোনা কি যশোদা সাজা দুষ্কর।

ব্রেকের মোড়ক ছাড়ায় অবনী।

ঘুম! ঘুম!

এই কি তোমার প্রেম ওগো হৃদয়হরণ!

স্বপ্নের মত এক আচ্ছন্নতায় মনটা আস্তে আস্তে অবশ হয়ে যাচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে! চিরকালের মত—

এক লাথিতে গামলাটা ফেলে দিয়ে—এখনও সময় আছে—গলা চিরে —এখনও সময় আছে—চিৎকার করে উঠবে?

না না না! মনের ইচ্ছাকে আর প্রশ্রয় দেওয়া নয়। না না না! এমন সাধের স্বপ্নকে তছনছ করে দিতে চায় না অবনী। না না না!

অবনী যে স্বপ্নদর্শী। চিরকাল স্বপ্ন দেখে এসেছে, স্বপ্ন দেখে যাবে।

স্বপ্ন! স্বপ্ন!

স্বপ্ন দেখে হেমন্তও। মদ খেয়ে স্বপ্ন দেখে। রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনে স্বপ্ন দেখে। সে-স্বপ্ন সাময়িক। অলীক। নিজেকে যে ঘৃণা করে, মানুষকে যে ঘৃণা করে—সে কী সত্যিকারের স্বপ্ন দেখতে পারে?

স্বপ্ন দেখে প্রীতি। স্বপ্ন দেখে আরেক জন্মে তাকে এভাবে বাঁচতে হবে না। স্বপ্ন দেখে সে-জন্মে সে অবনীর ঘরণী হবে।

আরেক জন্ম। জন্মান্তর বলে কিছু আছে?

তাহলে বাবা কেন—

বাবা! বাবা!

অবনীর মনে হয় সে এই পৃথিবী ছাড়িয়ে উঠতে উঠতে উঠতে উঠতে উঠতে উঠতে অনেক অনেক অনেক ওপরে উঠে গেছে।

এবং এই পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে হাসছে। পচাগলা এই পৃথিবীটাকে মুখ ভেঙাচ্ছে।

হেমন্ত তাকে বড় আহাম্মক বানিয়ে গিয়েছিল—এখন দেখুক হেমন্ত শেষ পর্যন্ত আহাম্মক বনে কে!

সকাল

বুক চাপড়ে একটি মানুষও কেঁদে উঠল না?

বুক চাপড়ে কেন বিনিয়ে বিনিয়েও কেউ কাঁদছে না। কারও চোখ ছলছল করছে না। শুধু মুখগুলি সবার থমথমে হয়ে গেছে। অস্বাভাবিক রকমের থমথমে।

অনাদির মুখ অনিমেষের মুখ জ্যোৎস্নার মুখ তাই একাকার। মীরা এবং ভবতোষের মুখও।

মৃত্যুটাই অস্বাভাবিক বলে?

কিন্তু অস্বাভাবিক হলেও সব মৃত্যুর মানেই তো এক—একটি মানুষের জন্মের মত চলে যাওয়া?

জন্মের মত একজন চলে গেল, আর কখনও কোনদিনও তার দেখা পাব না—একথা ভাবলেই কি বুকটা মোচড় দিয়ে প্রাণটা হাহাকার করে ওঠে না? ওঠাই কি স্বাভাবিক নয়?

প্রীতির ধাঁধা লাগে। ধাঁধা লাগে শুধু অনাদি-অনিমেষের নয় নিজের কথা ভেবেও: কই, সেও তো বুক চাপড়ে একবারও কেঁদে ওঠে নি! কাঁদছে না এখনও!

শুধু একটা আর্তনাদ করে উঠেছিল—অস্পষ্ট মনে পড়ে।

তার আর্তনাদ শুনে অনাদি ছুটে যায়। ঘুম-জড়ানো চোখে প্রথমে ঠাওর হয়নি, তাই 'সাতসকালেই হল্লা শুরু করেছ!' বলে ধমক দেয়, কিন্তু খাটের দিকে চোখ পড়া মাত্র আঁৎকে ওঠে। 'কী সর্বনাশ! কী সর্বনাশ!' বলতে বলতে ঠক ঠক করে কাঁপতে শুরু করে। তারপর আচমকা ছিটকে বেরিয়ে যায়।

অস্পষ্ট মনে পড়ে।

প্রীতি তখনও ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। অবিচল। খাটের দিকে চেয়ে। অপলক।

মশারির তিন কোণ খোলা, ছেঁড়াছোঁড়া। বালিশ ঘাড়ের নিচে, মুখ কড়িকাঠের দিকে, বোজা দুই চোখ। লুঙিটা পেটে গোটানো, ডান হাত খাট থেকে ঝুলছে, বাঁ হাত বিছানার চাদর খামচে।

বাবলার ওপর গামলাটা উপুড় হয়ে। আধখানা মানুষের দেহটা থকথকে রক্তের ওপর শোয়ানো। সে-রক্ত হালকা লাল, টকটকে লাল, কালচে লাল। খাট থেকে গড়িয়ে নর্দমা পর্যন্ত গেছে রক্তের ধারা—মোটা থেকে ক্রমে সরু হয়ে।

অনাদি বেরিয়ে যাওয়ার পর রাম্বু ঢুকেছে, প্রীতি ফিরেও চায়নি, তার ভয়ার্ত চিৎকার টের পেয়েছে। রাম্বু পালিয়ে এসেছে। [illegible] কাউকে ঢুকতে দেয়নি। 'খবর্দার! বাবা ওঘরে যেতে মানা করে গেছে।' বলে সবাইকে আটকেছে। 'আমি দেখব।' বলে সত্য বায়না ধরলে তাকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে গেছে। ঘর থেকে তাকেও বেরিয়ে আসতে বলেছে। বারবার মা করে ডেকেছে।

গরম চায়ে প্রীতির তলপেট তখন জ্বলেপুড়ে যাচ্ছিল, তবু সে এক চুল নড়েনি, মেয়ের ডাকে সাড়া দেয়নি।

কেন? পাছে ছন্দোপতন হয়? প্রীতি কি আশা করেছিল মিনিটের পর মিনিট এইভাবে চেয়ে থাকলেই দৃশ্যটা বদলে যাবে? গায়ের গন্ধে আজও তার উপস্থিতি ও টের পাবে। ঘুম ভাঙবে, ধীরে ধীরে চোখ মেলে চাইবে। ঘুম-ঘুম চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকবে। তারপর 'একি তুমি!' বলেই ধড়ফড় করে উঠে বসবে, লুঙি সামলাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠবে। প্রীতি তখন ফিরে দাঁড়াবে, জানালার কাছে চলে যাবে। শাসনের সুরে বলবে 'ফের যদি আমায় না জাগিয়ে ঘরে ঢোক ভালো হবে না কিন্তু!' জবাবে শব্দ করে প্রীতি হেসে উঠবে। চটুল গলায় বলবে, 'এই জন্যেই তো রোজ বলি হাফপ্যান্ট পরে শোও। দিনকে দিন বয়েস যখন কমছে!'

প্রীতি কি আশা করেছিল মিনিটের পর মিনিট যদি নাও হয় অনন্তকাল এই ভাবে চেয়ে থাকলে ভয়ংকর এই দৃশ্য বদলে গিয়ে অতি পরিচিত দৃশ্যটা ফুটে উঠবেই?

ভেবেছিল যত ভয়ংকরই হোক এ মিথ্যে, অবাস্তব—কবির হাজারো শখের একটি? এতদিন প্রীতিকে অবাক করে দেবার শখের প্রমাণ দিয়েছে, আজ দিচ্ছে ভয় পাইয়ে দেবার শখের প্রমাণ?

মাঝে মাঝে প্রীতিকে কষ্ট দিয়েই না মানুষটা আনন্দ পায়? প্রীতির হাসিতে যেমন মানিক কান্নায় তেমনি মুক্তো ঝরে বলে?

প্রীতিও এর শোধ তুলবে। দৃশ্যটা বদলাক, বদলাক না প্রীতিও দেখিয়ে দেবে শুধু কাঁদতে নয় কাঁদাতেও সে জানে।

কিন্তু এখন প্রীতি কাঁদবে না। কক্ষনো না। তার কান্না থামিয়ে সোহাগ করার সাধ মেটাবার সুযোগ ওকে কিছুতেই আজ দেবে না।

আজ প্রীতি ওকে আগে কাঁদাবে, মাপ চাওয়াবে, তারপর নিজে কাঁদবে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রীতি স্বপ্ন দেখছিল? মীরা হাত ধরে টানা মাত্র স্বপ্নের ঘোরে চলে আসে? এ-ঘরে এসেও স্বপ্নের ঘোরে ভাম হয়ে ছিল? বারবার যে কলিং বেলের দিকে তাকাচ্ছিল সে-ও ওই স্বপ্নের ঘোরে?

সেই স্বপ্ন ছুটল কখন?

অনাদি ডাক্তার নিয়ে এসেছে। অনাদির ফোনে পুলিশ এসেছে। এসেছে পাড়ার লোকজন। সবার শেষে এসেছে অনিমেষ জ্যোৎস্না। অনেকগুলি মানুষের চলাফেরায় চাপা কথাবার্তায় বাড়িটা গমগম করছে—তাইতেই ছুটে গেছে প্রীতির স্বপ্নের ঘোর?

প্রীতি আড়ে আড়ে জ্যোৎস্নার দিকে চায়: সে না বড় আশা করেছিল জ্যোৎস্না এসেই ডুকরে কেঁদে উঠবে, তাকেও প্রাণ খুলে কাঁদার সুযোগ দেবে?

জ্যোৎস্না কাঁদেনি, কাঁদছে না।

রাহু ঘরের কোণে চেয়ারে বসে, টেবিলে হেলান দিয়ে। ও-ও কাঁদছে না।

অনাদি, অনিমেষও বারদুয়েক এসে ঘুরে গেল—জল নেই কারো চোখে।

থম ধরে আছে মীরা। তাকে এখানে নিয়ে আসার সময় ফোঁপাতে শুরু করেছিল, কিন্তু আর ও চোখের জল ঝরাবে না: সহোদর দুই ভাই, দুই ভাই-বৌ, চার ভাইপো-ভাইঝি যখন কাঁদছে না, ওর কাঁদা সাজে!

কিন্তু কেন কাঁদছে না কেউ? ঘটনার আকস্মিক প্রচণ্ডতায় স্তম্ভিত হয়ে গেছে বলে? প্রচণ্ড শকে মানুষ যেমন বোবা হয়ে যায়?

অনাদি সাবধান করে দিল, 'ছোটকা এসে যদি উইলের কথা জিজ্ঞেস করে, বলো তুমি কিচ্ছু জানো না।'

স্তম্ভিত মানুষ একথা বলতে পারে?

অনিমেষটা এসে বলল, 'যে মেজদা টি-এ-বি-সি নিতে ভয় পেত সে-ই কিনা ঠাণ্ডা মাথায়—হরিবল্।'

স্তম্ভিত মানুষ এভাবে কথা বলে?

জ্যোৎস্না বলল, 'ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যে। যেভাবে উনি বেঁচে ছিলেন!'

স্তম্ভিত মানুষ দিতে পারে ভগবানের দোহাই? আপন জন মারা গেলে ভগবানের গুণ গাওয়া সম্ভব?

'সে অবিশ্যি ঠিক! আমি ওঁকে আজই প্রথম দেখলুম। সত্যি, এতগুলি বছর যে কী ভাবে—'

হ্যাঁ, জ্যোৎস্নার ওকথার জবাবে মীরা একথা বলতে পারে। মীরা তো পর। পর হয়েও মীরা কম করছে না। সাত সকালেই যে এক প্রস্থ সাজগোজ করে, আজ সে বাসী কাপড়ও ছাড়েনি। ও ঘর থেকে তাকে নিয়ে আসার সময় ও একবার ফুঁপিয়েও উঠেছিল—এই মৃত্যুর জন্যে একমাত্র ওই ক'ফোঁটা চোখের জল ফেলেছে। তার পর থেকে ঠায় পাশে বসে। নিজের ঝি-কে ডাকিয়ে তার ছেলেমেয়েদের জলখাবারের, অনাদিদের চায়ের ব্যবস্থা করেছে। ঠাকুরকে ওপরের উনোন ধরাতে মানা করে দিয়েছে। সত্য আবোল তাবোল প্রশ্ন করছিল বলে মিনু টুনুকে দিয়ে তাকে নিজের ঘরে পাঠিয়েছে। না-কাঁদার ক্ষতিপূরণ মীরা করেছে। ওর পক্ষে যতটা করা সম্ভব।

প্রীতি যদি কাঁদত, মীরাও তার সঙ্গে কেঁদে উঠত। একদিকে মীরার মনটা যেমন একরোখা অন্যদিকে তেমনি নরম—প্রীতি জানে।

প্রীতি কাঁদছে না কেন? আর কেউ কাঁদছে না বলে?

নাকি তার কান্না শোনা মাত্র পাছে অনাদি ছুটে আসে, দুই চোখ কুঁচকে বাঁকা হাসি হাসে—সেই ভেবে?

নীপবনে-

ফাঁদে-পড়া জানোয়ারের মত প্রীতি ছটফটিয়ে ওঠে।

'দিদি!' প্রীতির কোলে হাত রাখে জ্যোৎস্না।

জ্যোৎস্নার হাতখানা আঁকড়ে ধরে প্রীতি।

'বুঝি দিদি! তোমার যে কী হচ্ছে—!'

বোঝে? প্রীতির বুকখানা যে অসহ্য কান্নার চাপে ভেঙে-গুঁড়িয়ে যাচ্ছে জ্যোৎস্না বোঝে? প্রীতি যদি এখন জ্যোৎস্নাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ওঠে জ্যোৎস্নাও কাঁদবে তো? না সে তখন ভগবানের দোহাই দিয়ে তাকে থামাবার চেষ্টা করবে?

'জানেন মিসেস মজুমদার, মেজদার জন্যে দিদি যা করেছে মাও নিজের ছেলের জন্যে করে না।'

'জানি না! নিজের চোখেও এক বছর ধরে দেখছি।'

'এক বছর?'

'তা হয়েছে বইকি। এই অঘ্রাণে—'

'আমি জানতাম না।' একটু থেমে জ্যোৎস্না বলে, 'আমি আজই এসে শুনলাম—'

মীরা বলে, 'আপনি তো বড় একটা আসেন না। আপনাকেও আমি আজ প্রথম—'

'উনি প্রায়ই আসতেন।' প্রীতির মুঠো থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নেয় জ্যোৎস্না।

'অনিমেষবাবু তো জানতেন। এখানে এলেই উনি আমাদের ঘরে যান।'

'আশ্চর্য! আমায় কিন্তু ঘুণাক্ষরেও কিছু বলেনি।' জ্যোৎস্না দরজার দিকে তাকায়। প্রীতি দেখে জ্যোৎস্নার নাকের পাটা ফুলে উঠেছে, দুই ভুরু জুড়ে এসেছে। পারলে এখুনি স্বামীকে ডেকে কৈফিয়ত তলব করে।

জ্যোৎস্নার হাতখানাই না বুকে চেপে ধরবে ভাবছিল প্রীতি, কেঁদে ওঠার ভূমিকা হিসেবে। এখন তার বুক দুরদুর করে: এ নিয়ে জ্যোৎস্না কি একটা কেলেঙ্কারি করবে নাকি?

বিচিত্র না। ওর মত মেয়ের পক্ষে কিছুই বিচিত্র নয়। এ সংসারে না থাকার কড়ারে যে বিয়ে করে, এ-বাড়িতে না থাকার জন্তে এখানকার কারো প্রতি কোন দায়দায়িত্বও নেই বলে সাফ জানিয়ে দেয়, মাসে একশোটা করে টাকা যে নিতান্ত দয়া করেই দেয় এবং দয়াটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার জন্তেই প্রতি মাসে অনাদি গেলে নিজে তার হাতে টাকা তুলে দেয়—বাড়িতে দেড়শো টাকার ভাড়াটে বসিয়েও তাকে জানানো হয়নি, এখনও তার কাছ থেকে মাসে মাসে টাকা আনা হচ্ছে, নিজের স্বামী পর্যন্ত ব্যাপারটা তার কাছে চেপে গেছে—এর পরেও জ্যোৎস্না যে স্থির হয়ে আছে সেই আশ্চর্য!

হঠাৎ প্রীতি গুমরে ওঠে: উপায় নেই। আর না কেঁদে তার পার নেই। হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে জ্যোৎস্নাকে চমকে দিতে, মনটা জ্যোৎস্নার ঘুরিয়ে দিতে হবে।

'দিদি! দিদি!' জ্যোৎস্না পিঠে হাত রাখে।

প্রীতি দমকে দমকে কাঁদে।

রাম্ন তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। মীরা এসে পাশে বসে।

'দিদি, কেঁদোনা! তুমিও যদি ভেঙে পড়—'

'প্রীতিদি! কাঁদে না—কাঁদে না—'

দুপাশ থেকে দুজনে প্রীতিকে সান্ত্বনা দেয়।

'বুঝি দিদি, তোমার দুঃখ আমি বুঝি। কিন্তু কেঁদে কী করবে বলো। যা হবার হয়ে গেছে, কাঁদলে তো আর মেজদা ফিরে আসবে না।' জ্যোৎস্না পিঠে হাত বুলোয়। 'কেঁদে আর কী লাভ, প্রীতিদি! কেঁদোনা।'

লাভ! কথাটা খচ করে কানে লাগে: জ্যোৎস্না যা অস্পষ্ট রেখেছিল মীরা তাই স্পষ্ট করে বলল? কেঁদে লাভ নেই?

তাই কেউ কাঁদছে না? তাই কারও চোখ পর্যন্ত ছলছল করছে না?

এতক্ষণে সকলের না-কাঁদার কারণটা যেন প্রীতি খুঁজে পায়।

লাভ, লোকসান। সংসারের সব কিছু লাভ-লোকসানের নিয়মে চলে। মানুষের সুখ-দুঃখও। মানুষ পেলে সুখী হয়, হারালে দুঃখ পায়। প্রাপ্তিটা বড় হলে হারানোর দুঃখ ঘুচে যায়।

যেমন ঘুচে গিয়েছিল বাবার।
ঘুচে গেছে মীরার।
ঘুচে গেল অনাদির

বাবার সামান্য সর্দিকাশি হলেই মা ডাক্তারের কাছে লোক পাঠাতেন। বাবা দুদিন বিছানায় পড়ে থাকলে তাঁর নাওয়া-খাওয়া মাথায় উঠত। কী করে বাবাকে সুখে রাখবেন সুস্থ রাখবেন সে নিয়ে তাঁর দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না। জুতোয় কালি দেওয়া থেকে বাবার প্রতিটি কাজ মা নিজের হাতে করতেন। প্রতিদিন সকালে উঠে বাবাকে প্রণাম করে সংসারের কাজে হাত দিতেন।

এ-জন্যে পাড়ায় মার সুখ্যাতির অন্ত ছিল না: ধনা ভটচাজের চাল-চলন ম্লেচ্ছের মত হলে কি হবে ভগবান ভটচাজ-বাড়ির উপযুক্ত বউই জুটিয়ে দিয়েছেন। গিন্নির পুণ্যে ধনা ভটচাজ তরে গেল। নইলে মাঝ বয়েসে চাকরি হারিয়ে ফের চাকরি পায়? চাকরি-না-থাকার বছরটা অবিশ্যি খুবই দুর্দশায় কেটেছে, বাড়ি বাঁধা পড়েছে, বউয়ের গয়নাগুলি গেছে, রোগে ভুগে ভুগে নিজেও মরার দাখিল হয়েছে—কিন্তু শেষ রক্ষা হয়েছে তো?

বাবাও বলতেন, 'তোমার কপালেই ভাগ্য ফিরল। এ চাকরিতে মাইনে বেশি, বিধবা পেনশন আছে। ভদ্র ব্যবহার। অসুখের জন্যে কামাই করলে এরা ছাঁটাই করে দেবে না। এখানেই মাড়োয়ারির সঙ্গে সাহেবদের তফাত। দুটোই বেনের জাত, কিন্তু একটা রক্তচোষা—'

মা থামিয়ে দিতেন 'ছি! ও কথা বলে না। একদিন যাদের নুন খেয়েছ—'

'খেয়েছি।' বাবা চটে উঠতেন, 'কিন্তু তার বদলে? পাঁচটা পর্যন্ত থাকার কথা কিন্তু আটটা-নটা পর্যন্ত বিনে পয়সায় খাটিয়ে নেয় নি? আর অসুখের জন্যে কদিন কামাই করলাম বলে দূর করে দিল? নেমকহারাম আমি না নেমকহারাম ওরা? আমাদের বিত্তেবুদ্ধি ভাঙিয়েই—'

মা ফের বাধা দিতেন: বিত্তেবুদ্ধির বড়াই করা ভালো নয়, ভালো নয়।

মার এক দূরসম্পর্কের কাকাও এমনি বড়াই করত। বলত, আমাদের

বিত্তেবুদ্ধির দৌলতেই মাড়োয়ারিরা যখন ফুলে-ফেঁপে উঠছে তখন আমরা নিজেরাই কেন স্বাধীন ব্যবসা করি না? দেশের নেতারাও বলছেন ব্যবসা ছাড়া বাঙালীর বাঁচার পথ নেই। টাকার অভাব? আমরাও ওদের মত লোটাকম্বল সম্বল করে নামব।

সরকারী চাকরি ছেড়ে সেই কাকা ব্যবসায় নেমেছিল। গন্ধতেল তৈরি থেকে শুরু করে হরেক রকমের ব্যবসা করেছে। রাস্তায় রাস্তায় জামাকাপড় পর্যন্ত ফিরি করেছে। কিন্তু ব্যবসায় বড়লোক হওয়া দূরে থাক শেষ পর্যন্ত শুধু দুমুঠো ভাতের জন্যে আজ তাঁকে উদয়াস্ত টিউশানি করতে হচ্ছে। ওদিকে মাথাও কেমন গোলমাল হয়ে গেছে, পড়াতে গিয়ে ছাত্রদের পরামর্শ দেয়—লেখাপড়া শিখে কচু হবে—ব্যবসা কর। ফলে এক টিউশনিও বেশি দিন থাকে না। সবাই তাকে পাগল বলে ক্ষেপায়।

বাঙালীর ছেলের চাকরি ছাড়া গতি নেই। এবং চাকরি যাওয়ার যে কী কষ্ট মা সেটা হাড়ে হাড়ে বুঝে গিয়েছিলেন। তাই বাবার ভালোমন্দের দিকে কত নজর।

কিন্তু নিজে যে দিনের পর দিন গলার ঘায়ে ভুগেছেন, কাউকে জানতেও দেননি। যখন জানাজানি হল, তখন আর উপায় ছিল না।

'কেন তুমি এমন করলে খুকির মা!'

বলে বাবা কেঁদে উঠেছিলেন।

মা ম্লান হেসেছিলেন।

সেদিন না বুঝলেও, পরে সে-হাসির মানে প্রীতি বুঝেছিল: ক্যান্সার রোগ ভালো হয় না। তবু টের পেলে বাবা চিকিৎসা করাতেন। সেই রাজ-রোগের মাশুল জোগাতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হতেন, ভেঙে পড়তেন। ফলে হয়ত হার্টফেল করতেন। ডাক্তারবাবু তো বলেইছিলেন বাবার হার্ট এমনিতেই খুব দুর্বল। দ্বিজেনবাবুর মত মানুষ যদি হার্টফেল করতে পারে বাবার পক্ষে অসম্ভব কি।

বাবা মারা গেলে তাদের পথে দাঁড়াতে হয়। এখন লোকে সতীসাধ্বী বলে মার যত প্রশংসাই করুক—তখন কেউ এসে পাশে দাঁড়াত না। পাড়ার

লোকের শ্রদ্ধাভক্তির দাম যে কতখানি বাবা বেকার থাকার সময় তার প্রমাণ মিলেছে: কেশব ভটচাজের ছেলে লেখাপড়া শিখে চাকরি করছে বলে আগে যারা তারিফ করেছে তারাই তখন গায়ে পড়ে আপশোস করত—বাপ-ঠাকুরদার পথ না ধরে কী ভুলই করেছে ধনা ভটচাজ। আবার 'চাল-কলা-খেকো বামুনের ছেলে সেজেগুজে অফিস চলে' বলে ছড়াকাটার জন্যে ছেলেমেয়েদের যারা লেলিয়ে দিত তারাও তখন নিজেদের বাড়িতে পুজো-আর্চার জন্যে একদিনও বাবাকে ডাকেনি। অথচ বাবা কলেজে পড়ার আগে চতুষ্পাঠীতে পড়েছিলেন, কাব্যতীর্থ উপাধিও তাঁর ছিল, পুরোহিতের কাজও কিছু দিন করেছিলেন।

এটা মা জানতেন। দুনিয়ার হালচাল মা বুঝে গিয়েছিলেন। কিন্তু কারো বিরুদ্ধে তাঁর নালিশ ছিল না। জীবনে যা-কিছু ঘটে সবই স্বাভাবিক বলে তিনি মেনে নিয়েছিলেন। তাই স্বামীর কান্নার অবুঝপনাকে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন।

মার মৃত্যুতে প্রীতি দুঃখ পেয়েছে, বাবা দুঃখ পেয়েছেন, কিন্তু মা মারা গিয়েছিলেন বলেই না বাবা নতুন একটি বউ নিয়ে আসতে পেরেছেন? অক্ষয় চাটুয্যের ছেলের সঙ্গে প্রীতির বিয়ে হতে পেরেছে?

সুতরাং মার মৃত্যুতে আখেরে লাভ না লোকসান হল?

মার মৃত্যুর সময় কেঁদেছিল বলে প্রীতির পরে দেওয়ালে মুখ ঘষে দিতে ইচ্ছে করত। নিজের মুখ, বাবার মুখও।

কিন্তু কাঁদার ভুল প্রীতি আর করেনি। বিয়ের পর বাপের ঋণ শোধ করে চলে আসার সময় কাঁদতে হয়। প্রীতি কাঁদেনি। কেন কাঁদবে? এই যে তার গা-ভরা গয়না, বাক্সভরা কাপড়চোপড়, দামী দামী দান-সামগ্রী, বিয়ের এত উৎসব-সমারোহ—এর জন্যে কি একটি পয়সাও খরচ হয়েছে বাবার? বরং মেয়ের বিয়ের দৌলতেই তাঁর পৈতৃক বাড়িটা সামন্তদের হাত থেকে উদ্ধার পেয়েছে, আগাপাশতলা মেরামত হয়েছে। মেয়ের বিয়ের দৌলতেই নতুন মার অনন্ত হয়েছে, বালা হয়েছে, তাঁর নামে পোস্টাপিশে পাশ-বই খোলা হয়েছে। মেয়েকে খাইয়ে-পরিয়ে মানুষ করার জন্যে আঠার বছরে কত খরচ করেছেন বাবা?

এর পরেও দুমুঠো চাল দিয়ে 'তোমার সব ঋণ শোধ করে দিলাম, বাবা।' বলে কান্নার মানে হয়?

নিজে কাঁদার বদলে বাবার কান্না প্রাণভরে দেখেছে। অবাক হয়ে বাবার কান্নার কারণ খুঁজেছে: কিসের লোকসানে কাঁদছে মানুষটা? একটা বউ যেতে আরেকটা বউ আনার আগে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল, কিন্তু একটা মেয়েকে বিদেয় করার আগেই তো দুটি ছেলেমেয়ে মজুত করে ফেলেছে, পিতৃস্নেহ ঢালবার পাত্র তৈরি করে রেখেছে। তবু কান্না!

কোন মানে হয় না কান্নার।

ঠিকই বলেছে মীরা—কেঁদে আর কি লাভ!

লাভ-লোকসানের হিসেব মীরাও বোঝে কড়ায়-ক্রান্তিতে: সুনীলবাবুর জন্যে ওরও নাকি দুঃখ হয়েছিল। মামলায় সুনীলবাবু কোন আপত্তি করেনি, কিন্তু আদালতের রায় বেরোবার পর মীরা যেদিন সত্যি সত্যি চলে আসে— সুনীলবাবু নাকি দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল।

'আমারও ভীষণ কান্না পাচ্ছিল, প্রীতিদি। হাজার হলেও সাতসাতটা বছর একসঙ্গে ঘর করছি। তাছাড়া এমনিতে মানুষটা ভালো, যাকে বলে একেবারে মাটির মানুষ। ইংরেজীতে অবশ্য একটা কথা আছে ভালো মানুষ মানেই ভালো স্বামী নয়, কিন্তু আমি তা মানি না। আমায় সুখে রাখার জন্যে কী-না করত! বাঁধা চাকরি ছাড়াও একটা পার্টটাইম কাজ নিয়েছিল, প্রতি সপ্তাহে সিনেমা-থিয়েটার, প্রতি মাসে নতুন শাড়ি, কমাস অন্তর গয়না—।'

এসব কথা মীরা প্রথম দিন বলেছিল। প্রথম প্রথম বলত। তারপর আস্তে আস্তে কথার ধরন পালটেছে। এক এক করে [illegible] দোষগুলি তুলে ধরেছে: মদ খেত মানুষটা। মাঝে মাঝে মাতাল হয়ে ফিরত। একদিন নাকি গায়ে হাত পর্যন্ত তুলেছিল। বউকে সন্দেহ করত। একা বাড়ি থেকে বেরোতে দিত না। ছেলেপিলে না হওয়ার জন্যে শাশুড়ী তাকে গঞ্জনা দিতেন, ও প্রতিবাদ করত না।

'আমি কতদিন বলেছি, হয় মাকে সব খুলে বলো, নয় মা ভাসুরের

কাছে থাকুন, তুমি আলাদা বাসা কর। কিন্তু মাকে ছেড়ে দাদাকে ছেড়ে উনি থাকবেন না—লোকে পাঁচ কথা বলবে। মিথ্যে আমিই বা কেন পড়ে পড়ে মার খাই, বলুন? সহ্যেরও তো একটা সীমা আছে, না-কি!'

মীরাকে শুধু মা বানাবার অক্ষমতা নয়—আসলে সুনীলবাবু মানুষটাও যে অমানুষ ছিল ইদানীং প্রাণপণে তাই বোঝাতে চায় মীরা: নিজের অক্ষমতার লজ্জা ঢাকার জন্যে সুনীলবাবু যদি স্ত্রীর নামে অকথা-কুকথা রটাতে পারে, আত্মরক্ষার খাতিরে মীরা পারে না? পারা উচিত না?

'জানেন, বলতেও ঘেন্না হয়, শেষের দিকে বার-মনও হয়েছিল!'

মীরার কথা শুনে আজকাল হাসে প্রীতি: বেচারা! কথার ঝোঁকে কথা বলে। মানে না বুঝেই কথা বলে।

সুনীলবাবুকে ছেড়ে এসে মীরার লাভই হয়েছে: বিয়ের বছর না ঘুরতে মা হয়েছে। মীরা এটা জানত বলেই চলে এসেছিল। এই জন্যেই চলে এসেছিল। তাই সুনীলবাবুর কান্নায় তার ভীষণ কান্না পেলেও কাঁদেনি।

কেঁদে লাভ?

লাভ, লোকসান!

ওই মানুষটার মৃত্যুতে এ-বাড়ির কারো কি কোন ক্ষতি হল যে দল বেঁধে কাঁদতে বসবে?

হ্যাঁ, যদি অনিমেষ মারা যেত—কেঁদেকেটে পাড়া মাথায় করত জ্যোৎস্না। যে-স্বামীকে এখন নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরায়, বিয়ে করে যাকে কৃতার্থ করেছে ভাব দেখায়, তারই মড়াটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আথালিপাথালি হাত-পা ছুঁড়ত: অনিমেষের অসময়ে মৃত্যুটা যে ভীষণ রকমের লোকসান!

যদি অনাদি মারা যেত—

অনাদির মড়াটা যেন সামনে পড়ে, কী করবে প্রীতি ঠাওর করে উঠতে পারছে না: এর মৃত্যুতে আমার লাভ, না লোকসান? এর মৃত্যুতে আমি কাঁদব, না কাঁদব না?

মনে মনে অনাদির মড়ার সামনে প্রীতি থমকে থাকে। জীবন-মৃ
লাভ-লোকসানের গোলোক ধাঁধায় দিশা হারায়।

অনাদি ঘরে ঢুকে বলে, 'দারোগাবাবু একবার এ-ঘরে আসবেন।'

'আমরা থাকব ?' জ্যোৎস্না মাথায় আঁচল তুলে দেয়।

'আমার আপত্তি নেই। তবে দারোগাবাবু যদি—'

'আমি যাই।' মীরা উঠে দাঁড়ায়। 'দেখি কুমির মা কতদূর কী করল। দারোগাবাবুকে চা দিয়েছে, অনাদিদা ? দেয়নি ? কী আশ্চর্য!' মীরা বেরিয়ে যায়।

অনাদি বলে, 'বৌমা, তুমি মীরাকে গিয়ে একটু সাহায্য কর। আমাদের জন্যেই ওরা স্বামী-স্ত্রীতে আজ অফিস কামাই করল। দুজনে যথেষ্ট করছে। ভবতোষ ক্লাবের ছেলেদের নিয়ে এসেছে, ওদের একটু জলটল খাইয়ে—ওঁ—ফিরতে ফিরতে কোন্-না সন্ধ্যে হয়ে যাবে। তোমার দিদিকে তো দেখছ।'

'দিদি খুব শক পেয়েছে।'

'আর শক!' সশব্দে অনাদি একটি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। 'কোথা থেকে কী যে হয়ে গেল!'

'মেজদা কেন এমন করলেন কিছু বুঝতে পারছেন ?'

'বুঝতেই যদি পারব বৌমা, তাহলে এমন কাণ্ড করতে পারে! আমার কপাল, বুঝলে, সবই আমার কপাল। সারাটা জীবন যাকে আগলে আগলে রাখলাম—।' অনাদি ফের দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

'আমি তো প্রথমে শুনে বিশ্বাসই করতে পারিনি। কবি মানুষ হয়ে এমন ভয়ংকর—'

'বিশ্বাস! তুমি শুনে বিশ্বাস করতে পারনি, আমার দেখেও বিশ্বাস হয়নি। কী নরম ছিল ওর মন! ছেলেবেলা থেকেই দেখছি তো। মাংস খেতে কত ভালোবাসত, কিন্তু একদিন পাঁঠা বলি দেখে মাংস খাওয়া ছেড়ে দেয়। একবার একটা পাখি—কাকাতুয়া—পুষেছিল—'

'জানি।'

'জানো ?'

'হ্যাঁ, আজই বলছিলেন।'

'ছোটকা? বলবে বইকি! ছোটকাও ওকে কম ভালোবাসত না। ওকে ভালো না বেসে পারা যায় না। আহা, অমন মন—শিশুর মত সরল—'

প্রীতি একবার স্বামীর একবার জ্যোৎস্নার মুখের দিকে তাকায়, যে যখন কথা বলে। তার চাউনিতে কি অস্বস্তি বোধ করছে অনাদি? নইলে তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে নিল কেন? কথাটা শেষ করল না কেন?

'দিদি এখনও এলেন না?' জ্যোৎস্না শুধায়।

অনাদি বলে, 'মালু কলকাতায় নেই, ফোন করেছিলাম—গতকালই ওরা দিল্লি গেছে। ওর ননদের মেয়ের বিয়ে।'

'শেষ দেখাটা দেখতে পেলেন না!'

'এই দৃশ্য না দেখাই ভালো বৌমা।' অনাদি বলে, 'তুমি যাও বৌমা, দারোগাবাবুর চা এঘরেই পাঠিয়ে দাও। মীরাই সব করছে, তবু বুঝলে না, হাজার হলেও—'

'মেয়েটি কিন্তু বেশ।'

'অতি চমৎকার মেয়ে। ওর স্বামী ভবতোষও। তোমরা না আসা পর্যন্ত আমি তো চোখে অন্ধকার দেখছিলাম। কী করব না করব কিছুই ঠিক করতে পারছিলাম না। ওরা দুজনেই তখন—তুমি এসো বৌমা।'

জ্যোৎস্নার ঘর থেকে যাবার ইচ্ছে ছিল না, মুখ দেখেই প্রীতি বোঝে। অনাদি যেন জোর করে তাকে বার করে দিল।

দরজার কাছে গিয়েও জ্যোৎস্না ফিরে আসে।

'কী?'

জ্যোৎস্না মাথা নেড়ে জানায় কিছু না। চটিজোড়া পায়ে দিয়ে যায়।

অনাদি মুখ বাঁকায়। 'নবাবের বেটি! জুতো ছাড়া এক পা চলতে পারেন না। আজ যে জুতো পায়ে দিতে নেই জানে না? তোমার বলা উচিত ছিল।'

'আমি।'

'হ্যাঁ, তুমি!' গলা চড়িয়েই খাদে নামায় অনাদি। কাছে আসে।

'ভালো কথা, শোনো, সেই উইলের কথা কিন্তু তুলো না। সেটা তো তোমার কাছেই আছে? থাক।'

অনাদি টেবিলটা খাটের কাছে টেনে আনে। চেয়ার আনে। আলমারির মাথা থেকে তার শখের অ্যাশট্রেটা নামিয়ে টেবিলে রাখে। পকেট থেকে গোল্ডফ্লেকের প্যাকেট বের করে।

সোজা হয়ে বসে প্রীতি: ফের ও-ঘর থেকে সিগারেট নিয়ে এসেছে! বিড়িখোরের এতই যদি শখ কিনে খেতে পারে না!

'ও একটা চিরকুট লিখে রেখে গেছে। ভাগ্যিশ ওটা আমার হাতে পড়ল।'

কী লাভ আর এই সিগারেটের প্যাকেট ও-ঘরে রেখে!

'আইনে অবিশ্যি এই চিরকুট টিকত না। তবু ওর মনটা বোঝা গেল। ওর জন্যে আমরা কী না করেছি, বলো? আর ও কিনা দানপত্র লিখে দিয়ে গেল—বাবার স্মৃতি রক্ষার জন্যে কিছু একটা করতে হবে। মানুষের জন্যে কত দরদ! তোমার কথাটাও ভাবল না।'

আমার কথা! কেন? শুধু আমার কথা ভাবার প্রশ্ন ওঠে কেন? আমার কথা ও ভাববে কেন?

'ছোটকা এসেই উইলের কথা তুলেছিল। ছোটকার মুখ দিয়ে বৌমাই তুলিয়েছিল—আমি কি আর বুঝিনি! তা আমি বললাম উইল ওর ঘরের আলমারিতে। এক কাজ করো, আমরা বেরিয়ে গেলে এক ফাঁকে গিয়ে আগেরটা ওখানে রেখে ওটা নিয়ে এসো। তুমি ভাবছ, আগেরটা পুড়িয়ে ফেলেছি, না? তোমায় মিথ্যে বলেছিলাম। ও বেঁচে থাকতে—বুঝলে না—হঠাৎ যদি দেখতে চেয়ে বসত? সেটা লাল তোরঙ্গের মধ্যে কম্বলের ভাঁজে আছে।'

প্রীতি কি অবাক হবে? চুরি করে এনেও সেটা পুড়িয়ে ফেলেনি বলে অবাক? স্বামী তাকে মিথ্যে বলেছিল বলে অবাক?

'ভেবেছিলাম হঠাৎ যদি মারাটারা যায়, তখন ওটা কাজে লাগবে।'

ভাইয়ের হঠাৎ-মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছিল ভাই? ভাইয়ের মরণ আশা করে ছিল?

অনাদি দরজার কাছে যায়, বাইরে উঁকি দিয়ে ফিরে আসে।

'আমি ঠিক করেছি শ্রাদ্ধশান্তির হাঙ্গামা চুকলে সব বেচে দেব। ভাগ পেলে ছোটকার আপত্তি হবে না জানি। তারপর একসঙ্গে রাস্থু মিহু টুম্বর বিয়ে দেব। মুশকিল হল সত্যকে নিয়ে। তবে থোক টাকা ধরে দিলে বৌমা নিশ্চয় ওর ভার নিতে রাজী হবে, কী বলো? ওদের তো মাত্র একটি মেয়ে। যদি হয় ভালো, নইলে সত্যকে দেওঘরের ইশকুলে দিয়ে আমরা দুজনে কাশী চলে যাব।'

হড়বড় করে কথা বলে যায় অনাদি। নতুন অভিনেতা যেমন স্টেজ থেকে পালাবার জন্যে কোনমতে পার্ট শেষ করে।

'সংসার করার সাধ আমার মিটে গেছে!'

কেন? এমন ভরা সংসার থাকা সত্ত্বেও, উটকো সম্পত্তির মালিক হয়ে বসা সত্ত্বেও মানুষের বৈরাগ্য আসে কেন?

'তুমি যে কোন কথাই বলছ না? আচ্ছা থাক, এসব কথা পরে হবে। দারোগাকে ডেকে আনি। তুমি এখন শুয়ে পড়ো। ওকে বলেছি তুমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে। এখনও ঠিকমত সামলে উঠতে পারোনি। আমি ব্যাটাকে ভাগাতেই চেয়েছিলাম—দারোগার জেরা! কিন্তু নাছোড়বান্দা লোকটা!'

অনাদি গোল্ডফ্লেকের প্যাকেট থেকে একটি সিগারেট বের করে। মুখের কাছে নিয়েও কী ভেবে রেখে দেয়।

'ভেবেচিন্তে কথা বলো কিন্তু। তুমি অবিশ্যি আমার চেয়েও অনেক বুদ্ধি ধরো, তবু এই অবস্থায়—'

এমন একেকটি কথা আছে, অতি সাধারণ কথা, কিন্তু একেক জনের মনে তার প্রতিক্রিয়া হয় অসাধারণ। কড়াই-উপছে-পড়া ফুটন্ত দুধে লেবুর রস দেওয়া মাত্র দুধের উথলানো যেমন বন্ধ হয়ে যায়, শুধু বন্ধ হওয়া নয় ছানা-জলে ভাগ হয়ে গিয়ে দুধ আর দুধই থাকে না—এই সব কথাও তেমনি তছনছ করে দেয় মানুষের মনকে।—শীলাদি বলত। প্রীতির মনের কথাই যেন বলত।

শুধু কয়েকটি কথা নয়, কয়েকটি ঘটনার, কয়েকটি স্মৃতির দাপট যে কী

ভয়ানক নিজের জীবনেই প্রীতি তার প্রমাণ পেয়েছে। বলতে কি, নিজের জীবনের কথা ভাবলে কয়েকটি কথা, কয়েকটি ঘটনা, কয়েকটি স্মৃতিই কেবল ভিড় করে আসে।

কয়েকটি কথা আর কয়েকটি ঘটনা আর কয়েকটি স্মৃতির যোগফল যেন আটত্রিশ বছরের জীবন।

তুমি আমার চেয়েও অনেক বুদ্ধি ধরো। আজ নিয়ে কতবার এই কথাটা বলল অনাদি ?

চিত হয়ে চোখ বুজে মন হাতড়ায় প্রীতি।

তার বোকামির জন্যে উদ্বেগের অন্ত ছিল না মায়ের: এ মেয়ে কী করে পরের ঘর করবে! সংসার সামলাবে!

বাবা বলতেন, মেয়েরা বোকা হওয়াই ভালো। নইলে সংসারে শান্তি থাকে না।

অথচ বিয়ের কদিন পরেই স্বামী সার্টিফিকেট দেয়: তুমি দেখছি আমারও এক কাঠি ওপরে। এরি মধ্যে বাবাকে হাত করে ফেলেছ! তা কেমন বাপের মেয়ে দেখতে হবে তো!

নিজের বাপ সম্পর্কে নিজের যে-ধারণাই থাকুক, স্বামীর কাছে তার নিন্দে শুনলে বউয়ের মন রুখে ওঠেই। নতুন বউয়ের মন।

'তোমার বাপই বা কম কি। টাকার লোভ দেখিয়ে—'

'আমার বাপকেও আমি রেয়াৎ করে কথা কইছি না। দুইজনে অতিশয়—কী বলব—হাজার হলেও গুরুজন!'

এরপরে আর কথা চলে না।

'জানো, বাবা কি মতলব আঁটছেন? তাঁর নাকি আর সংসারে মন নেই। এখন সব বেচে বিলিয়ে দিয়ে ধম্মকম্ম করবেন।'

জানে না, তবে শ্বশুরের কথায় তার আভাস কিছু-কিছু পেয়েছে। যার এত নামডাক প্রতাপের কথা শুনেছিল, সেই লোকটাকে দেখছে সব সময় ঝিমোয় আর আপন মনে বিড়বিড় করে। কেমন যেন ছন্নছাড়া

চালচলন। ভেবেছে এই বয়সে বউ নেই, কারখানায় গোলমাল, এক ছেলের ওই অবস্থা—বুড়ো মানুষের মন বিগড়ে যাওয়া কিছু বিচিত্র নয়।

স্বামীর কথায় প্রীতির টনক নড়েঃ শ্বশুর যদি সত্যি সব বেচে-বিলিয়ে দেয়, তার অবস্থা কী হবে? তার লেখাপড়া-জানা বাবাকেই যখন একটা চাকরি যেতে এক বছর বেকার থাকতে হয়েছিল, রোজগারের ধান্দায় উদয়াস্ত টো টো করতে হয়েছিল—এই লোকটার উপায়? অক্ষয় চাটুয্যেকে বাদ দিয়ে এর কোন্ পরিচয়?

ব্যবসা করবে? স্বাধীন ব্যবসা? মার সেই কাকা পথে বসলেও ব্যবসা করে বড়লোক অনেকে হয়। যেমন অক্ষয় চাটুয্যে। তার ছেলেও হয়ত ব্যবসায় নামবে। অক্ষয় চাটুয্যে নাকি নোট জাল করে ব্যবসার পুঁজি জোগাড় করেছিল, ছেলের সে দরকার হবে না। তার বউয়ের গায়ে কমসে কম হাজার বিশেক টাকার গয়না আছে। এই গয়না কাউকে দান করার এক্তিয়ার শ্বশুরের নেই, কিন্তু ছেলে অনায়াসে হাত পাততে পারে?

এবং স্বামীর জন্যে সর্বস্ব সঁপে দেওয়াই স্ত্রীর কর্তব্য।

প্রীতিকেও সে-কর্তব্য পালন করতে হবে। তার ফলে যদি গলায় রক্ত উঠে মরেও যায়, ক্ষতি নেই, ধন্য ধন্য করবে সবাই। স্বামী বুক চাপড়ে কাঁদবে। কাঁদতে কাঁদতেই স্ত্রীকে আনকোরা লালপাড় শাড়ি পরিয়ে দেবে, সিঁদুরে মাথা মাখামাখি করে দেবে, ফুল নিয়ে আসবে, খাট নিয়ে আসবে, চোখ মুছতে মুছতে শ্মশানে যাবে, মুখে আগুন দিতে গিয়ে 'আমি পারব না! আমি পারব না!' বলে চিতার সামনে কেঁদেকেটে এক অনর্থ করে বসবে।

তারপর—

তারপর?

টোপর পরে বউকে আঁচলে বেঁধে ঘোড়ার গাড়ি থেকে নামছে বাবা হঠাৎ টোপরটা টাল খেতেই তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে সামলান—দৃশ্যটা চোখের সামনে জলজল করে ওঠে প্রীতির।

'বাবা নিজে থেকে তোমায় কিছু বলেছেন?' প্রীতি জিজ্ঞেস করে।

অনাদি বলে, 'বাবা কারো পরামর্শ নিয়ে কাজ করেন না। তবে যা

শুনছি মনে হয় মেজকার একটা পাকা ব্যবস্থা হবে, ছোটকার ভবিষ্যতেরও একটা সুরাহা হবে—মরতে মরবে এই শর্মা।'

বুকটা প্রীতির ধক করে ওঠে। স্বামীর মৃত্যু মানেই স্ত্রীর মৃত্যু : কী সুখের সংসার ছিল কমলার। আর আজ ছেলেপুলে নিয়ে ভাইয়ের আশ্রয়ে তাকে দাসীবাঁদীর বেহদ্দ হয়ে কাটাতে হয়। স্বামীকে অত ভালোবাসত যে কমলা দিনরাত সে স্বামীকে এখন শাপশাপান্ত করে।

'বাবার যদি ভীমরতি হয়ে থাকে, তুমি তাতে সায় দেবে কেন? উনি যদি পাগলামি শুরু করেন—'

'পাগলামি? বাঃ, চমৎকার বলেছ তো!' অনাদি সোচ্চার তারিফ করে ওঠে। ঘন ঘন মাথা নাড়ে। ঘরের মধ্যে পায়চারি শুরু করে দেয়।

'কী হল?'

'নাটু দত্ত-ও ওই কথা বলেছিল—পাগলামি।'

'নাটু দত্ত?'

'অ্যাটর্নি। তবে নাটু দত্তকে দস্তুরমত তিন দিন ভেবে বলতে হয়েছে, সে জন্যে তাকে নগদ দস্তুরি দিতে হয়েছে। আর তুমি কেমন চট করে—না, সত্যি তুমি বুদ্ধিমতী। আমার চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধি ধরো।'

প্রীতি বোকা বনে চেয়ে থাকে। কথার পিঠে কথা বলেছে মাত্র, এর মধ্যে বাহাদুরিটা কোথায় ভেবে পায় না।

'হুঁ, পাগলামি—নিছক পাগলামি। একটু একটু করে এই পাগলামি বাড়বে, তারপর স্রেফ পাগল হয়ে যাবে। তবে হ্যাঁ, পাগলামিটা প্রমাণ হওয়া দরকার। সে জন্যে কোর্ট-আদালত করতে হতে পারে। যদি মামলা হয় তোমাকেও গিয়ে সাক্ষী দিতে হবে। হয়ত হাকিমের সামনে বলতে হবে—দুপুর বেলা তুমি যখন শুয়ে ছিলে বাবা ঘরে ঢুকে হঠাৎ তোমায়—পাগলের কাণ্ড তো—হ্যাঁ, হঠাৎ তোমায় জড়িয়ে ধরেছিলেন। কী, পারবে না বলতে?'

এই ব্যাপার! প্রীতি ঠোঁট উল্টে হাসে: প্রায় তারই সমবয়সী একটি মেয়েকে যদি এক বাবা রাতের পর রাত ঠাণ্ডা মাথায় তার সামনে ঘরে নিয়ে

গিয়ে খিল দিতে পারে, আরেক বাবা পাগলামির ঘোরে তাকে শুধু একবার জড়িয়ে ধরবে—এ আর নতুন কি!

শ্বশুরের নামে আদালতে গিয়ে সাক্ষী দেবার জন্তে প্রীতি ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। কবে, কতদিনে মামলা শুরু হবে—সেই প্রতীক্ষায় ছটফট করছিল।

এ-বাড়িতে পা দেওয়ার দিনই শ্বশুর যখন 'আজ থেকে এই অভাগার ভার তোমাকে দিলাম, বৌমা!' বলে তার খোঁড়া ছেলেটার হাতটা অবিকল সম্প্রদানের ভঙ্গিতে তার হাতে তুলে দেয়, সারা শরীর ঘিনঘিন করে উঠেছিল প্রীতির, আধখানা সেই বীভৎস দেহটার দিকে ভালো করে তাকাতে পর্যন্ত পারেনি।

কিন্তু এখন আধখানা সেই দেহের খেদমতেই উঠে পড়ে লাগে। নাওয়ানো খাওয়ানো থেকে শুরু করে সেটার পায়খানা পর্যন্ত সাফ করে। আপত্তি করলে মধুর হেসে 'আমি কি তোমার পর ঠাকুরপো!' বলে উড়িয়ে দেয়।

মামলা হলে এই লোকটারও সাহায্যের দরকার হবে না?

তার সেবার বহর দেখে শ্বশুরের খুশিতে যেন লালা ঝরে। 'আহা! মা যেন আমার মূর্তিমতী—'শ্লেষ্মায় বুড়োর গলা বুজে আসে।

'কী ব্যাপার!' অনাদিও তাজ্জব। 'বরের চেয়ে যে দেখছি দেবর বড় হয়ে উঠল। তা মেজকার পা দুটো কাটা গেলে কী হবে আর সব দিক দিয়ে ও আমার চেয়ে—'

শোন কথা! স্বামী স্বামী—কারো সঙ্গে তার তুলনা হয়। বাবার পাশে নতুন মাকে কী বিচ্ছিরি বেমানান দেখায়, তাই বলে বাবার ঘর করছে না নতুন মা? অনাদির বদলে ওই আধখানা মানুষটার সাথেই যদি প্রীতির গাঁঠছাড়া বেঁধে দেওয়া হত—ওর বউগিরিই করতে হত না প্রীতিকে?

'মামলার কথায় প্রথম দিকে মেজকা গাঁইগুঁই করেছিল, এখন নিমরাজী হয়েছে।'

তবে! এ কার বাহাদুরি? প্রীতি ঠিক করে এবার থেকে দুপুরেও

মাথায় হাত বুলিয়ে বুলিয়ে ওকে ঘুম পাড়াবে। তাহলেই রাজী হয়ে যাবে ষোলআনা।

'আমি অবশ্য ওকে বুঝিয়েছি যে বাবা আমাদের তিন ভাইকেই পথে বসাবার ফিকির করছেন।'

তা এটুকু অনাদিকে করতে হবে বইকি। হাজার হলেও প্রীতি পরের বাড়ির মেয়ে, তার নতুন বউ। এ-সব ব্যাপার নিয়ে স্পষ্টাস্পষ্টি কিছু বলা তার মানায়?

'বাবা নাকি মন্মথ উকিলের সাথে কথা বলছেন। নাটু দত্ত খোঁজখবর রাখছে। ও যখন কথা দিয়েছে শেষ পর্যন্ত সামলাতে পারব ভরসা আছে।'

শেষ পর্যন্ত সামলাতে অনাদি পারেনি।

সবার ওপর টেক্কা দিয়ে গেল অক্ষয় চাটুয্যে।

বিশ্বাসঘাতক বুড়ো। প্রীতিকে রাজরানী করে এনে চাকরানী বানিয়ে রেখে সরে পড়ল!

হ্যাঁ, চাকরানী: একটা অপদার্থ, একটা বিকলাঙ্গ আর একটা নাবালকের মুখ চেয়ে যাকে জীবন কাটাতে হবে সে চাকরানী ছাড়া কি।

একেক সময় প্রীতির ইচ্ছে করে আত্মঘাতী হয়: কেন, কিসের জন্যে বেঁচে থাকবে? ভবিষ্যতের আশায়? প্রীতির ভবিষ্যৎ?

একদিন প্রীতির বড় সাধ ছিল বাঁচার। ভবিষ্যতের অনেক স্বপ্ন দেখেছিল: বাবার মত বর হবে তার, মার মত সে গৃহিণী হবে। এমনি একটি সুখের সংসার গড়ে তুলবে। মা-বাবা যখন হাসাহাসি করতেন—বুকে প্রীতির কাঁপন জাগত। সে-ও তার স্বামীর সঙ্গে এইভাবে খুনসুটি করবে। একটি ছেলে নেই বলে মার বড় দুঃখ—প্রীতির নিশ্চয় এ-দুঃখ থাকবে না। কত ছেলে-মেয়ের মা হবে প্রীতি!

কিন্তু বাবা যেদিন তাকে শীলাদিদের বাড়িতে পাঠিয়ে বিয়ে করতে যান সেই দিনই তার সব সাধ সমস্ত স্বপ্ন চুরমার হয়ে গিয়েছিল।

শীলাদিদের বাড়ির ছাদ থেকে বাবাকে নতুন বউ নিয়ে গাড়ি থেকে নামতে দেখে আচমকা আরেকটা সাধ মনে তার চাড়া দিয়ে উঠেছিল

দোতলা থেকে রাস্তায় ঝাঁপিয়ে পড়ার সাধ। ঝাঁপ দিয়ে বাবারই সামনে তালগোল পাকিয়ে মরার সাধ।

অনেক কষ্টে সেই সাধ প্রীতি দমন করে: তাহলে যে জীবনের কিছুই জানা হবে না। তার এতদিনের জানাটা আজ মিথ্যে হয়ে গেছে বটে কিন্তু জীবনটা তো পড়ে আছে?

শীলাদিরা ব্রাহ্ম। শীলাদি বি-এ পাশ। শীলাদি অনেক পড়াশোনা করেছে। শীলাদি অনেক কিছু জানে। কত খবর রাখে। শীলাদি বলে, মানুষের জীবন নাকি বড় বিচিত্র।

বিচিত্র! ওটা শীলাদির বই-পড়া কথা। নিজের জীবন দিয়ে প্রীতি জেনে গেছে জীবনটা বহুরূপী।

কিন্তু বহুরূপীরও তো একটা নিজস্ব রূপ থাকে? নিতাই বহুরূপী কোন-দিন সাহেব সেজে আসত, কোনদিন ফুলবাবু, কোনদিন পাঞ্জাবী ড্রাইভার। প্রত্যেকবারই তাকে দেখে মনে হত সে যেন সত্যিই সাহেব, সত্যিই ফুলবাবু, পাঞ্জাবী ড্রাইভার সত্যিই। কিন্তু বকশিশ নেবার জন্যে যেদিন খাটো ধুতি আর ছেঁড়া শার্ট পরে এসে দাঁড়াত, রীতিমত ধাঁধা লেগে যেত: এই তবে ওর নিজস্ব রূপ? নাকি বহুরূপীর এও এক রূপ?

জীবনের কোন্ রূপটা তার নিজস্ব? প্রীতির জীবনের? মার মৃত্যু পর্যন্ত তের বছরের জীবনের? তেরো থেকে পনেরো বছরের জীবনের? পনেরো থেকে আঠারোর? না, আজকের বিশ বছরের জীবনের?

নতুন মাকে দেখ: তিনটি ছেলেমেয়ে বিইয়েই কী ভীষণ মুটিয়ে গেছে। কথাবার্তায় পাকা গিন্নি হয়ে পড়েছে। আজ আর বাবার পাশে তাকে বেমানান দেখায় না। কদিন আগে এসেছিল, প্রীতি লক্ষ্য করেছে, আবার বাচ্চা হবে। মুখখানা তাই টসটসে। পেটটাও নিশ্চয় পাকা ফুটির মত নিটোল হয়ে উঠেছে। নিজেকে দিয়েই প্রীতি ওটা আন্দাজ করতে পারে।

চতুর্থবার মা হচ্ছে বলেও নতুন মা খুশী। প্রীতিকে উপদেশ দেওয়ার ছলে নিজের কথাই সাত কাহন বলে গেল। কিন্তু কই, প্রীতির তো নামমাত্রও আনন্দ হচ্ছে না? এই প্রথম মা হচ্ছে, সেজন্যে অনাদি খুশী, অবনী খুশী, অনিমেষ খুশী কিন্তু প্রীতির কেন নিজেকে ভয়ানক অশুচি মনে হয়? কেন

কেবলি মনে হয় বিষাক্ত পুঁজয়ক্তের জীবন্ত একটা ডেলাকে সে নিজের মধ্যে লালন করে চলেছে ?

শীলাদি বলে গেল, 'এ তোর বাড়াবাড়ি প্রীতি। একজনকে দেখে সবাইকে বিচার করিস। অতীত নিয়ে বড় বেশি ভাবিস। জীবনে না ভেবে কিছু করা উচিত নয় ঠিক কিন্তু ভাবনাটা তো জীবনেরই জন্যে? জীবন নিয়ে অত ভাবলে জীবনটাই যে অসহ্য হয়ে ওঠে। অতীত নিয়ে পড়ে থাকলে বর্তমান ভবিষ্যৎ বাতিল হয়ে যায়।'

শীলাদির কথাগুলিকে আজকাল বড় প্যাঁচালো মনে হয়। অথচ আগে শীলাদি কী সুন্দর সুন্দর কথা বলত। তার প্রতিটি কথা মনকে নাড়া দিত। এখন গুলিয়ে দেয়।

শীলাদি বদলে গেছে? স্বামীর সঙ্গে ফের মিলমিশ হয়েছে বলে অতীতকে মুছে ফেলেছে? তাই সে শুধু আজ বর্তমান ভাবে? ভবিষ্যৎ ভাবে?

ঠিক নতুন মায়ের মত? বিয়ের ছমাসেও যার মুখে হাসি ফোটেনি সে যেমন আজকাল কথায় কথায় হেসে গড়িয়ে পড়ে, মেয়ের সঙ্গে মাঝে মাঝে সখীর মত ব্যবহার করে বসে?

মানুষ বদলায়। প্রীতির চোখের সামনে সবাই বদলে যাচ্ছে। কিন্তু প্রীতি কেন বদলাতে পারছে না? প্রীতিকে কি জীবনভর দুর্বহ এই মানসিক যন্ত্রণা সইতে হবে? কয়েকটি কথা আর কয়েকটি ঘটনা আর কয়েকটি স্মৃতির জাবর কেটে বেঁচে থাকতে হবে?

'আগে একটি ছেলে হোক, তখন দেখবি। মা হলে মেয়েরা বদলে যায়।'

'কিন্তু তোমার তো শীলাদি—'

'আমার কথা আলাদা। সবাই সমান? আমি মা হতে চাই না, মন থেকেই চাই না। শুধু ঘর-সংসার নিয়ে আটকে থাকা আমার পোষাবে না। সেই নিয়েই তো ওর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়েছে।'

'জামাইবাবু বুঝি ছেলেপিলে পছন্দ করেন?'

'কোন্ স্বামী না করে?'

'তবে?'

'তবে কি? ওর সব পছন্দে আমায় সায় দিতে হবে? আমার

নিজের পছন্দ-অপছন্দ নেই? মতামত নেই? সংসার আর ছেলেপিলে মানুষ করার চেয়ে ইশকুলের কাজকে যদি আমি বড় মনে করি—'

'সারাজীবন শুধু ইশকুল নিয়ে থাকতে পারবে?'

'কেন পারব না। নিজের হাতে এই ইশকুল গড়ে তুলেছি, ছেলের মত একে মানুষ করেছি—'বলতে বলতে শীলাদি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল।

অথচ তার কদিন পরেই যে-ইশকুলকে ছেলের মত ভালোবাসত কমিটির সঙ্গে ঝগড়া করে সেই ইশকুল ছাড়ল। পরের দিনই স্বামীর কাছে এলাহাবাদ চলে গেল। এখন দিব্যি আছে। একটি মেয়ে হয়েছে। কবিকে তার নাম ঠিক করে দেবার জন্যে চিঠি লিখেছে। সারা চিঠি জুড়ে মেয়ের কথা, স্বামীর কথা, সংসারের কথা।

আর প্রীতি? পরপর দুটি মেয়ের মা হয়েও সে বদলাল কই?

এখনও কেন তার একেক রাতে ইচ্ছে করে একসঙ্গে দুজনের গলায় পাড়া দিয়ে ছাদ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়তে?

'তোমার কি হয়েছে বলো তো বৌদি?'

'কই!'

'বৌদি, আমার চোখে ধুলো দিতে পারবে না। আমি কবি, মনে রেখ।'

'কবিদের কি আশপাশের দিকে নজর দিতে আছে। তাদের তো শুধু কল্পনা নিয়ে—'

'ঠাট্টা নয়। আচ্ছা, একটা কথা স্বীকার করবে? আমায় নিয়ে কি তোমার খুব অসুবিধে হচ্ছে। তাহলে বরং একটা লোকটোক ঠিক করে—'

কী সর্বনাশ! যার জন্যে মাথা গোঁজার আশ্রয় জুটেছে তাকে নিয়ে অসুবিধে? হলে চলে? এ-আশ্রয় গেলে প্রীতি দাঁড়াবে কোথায়? সে না বদলাক দিনকাল কি ভীষণ বদলে গেছে দেখছে তো: যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, বোমা, স্বদেশী হাঙ্গামা। টগবগ করে ফুটছে মানুষের মন। শহরের রাস্তায় ধুকে ধুকে মরছে মানুষ। হাজার হাজার মানুষ। বাংলা দেশের গ্রামকে গ্রাম যেন মরার জন্যে এই শহরে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে।

'আমি তো মনে করেছি,' প্রীতি খাটে এসে বসে, 'তোমারই অসুবিধে হচ্ছে। বাচ্চাদের নিয়ে সামলাতে পারি না, দুদণ্ড তোমার কাছে বসতে পারি না, সময়মত তোমার—'

'আমার সব কিছু ঘড়ির কাটায় হচ্ছে। সে জন্যে নয়। তোমার মুখে হাসি নেই কেন?'

হাসি নেই কেন? স্বামীর রোজগারের ঠিকঠিকানা নেই বলে? চালের মণ চল্লিশ টাকা বলে? বাঁধা আয় না থাকা সত্ত্বেও বড়লোকী ঠাট বজায় রেখে চলতে হচ্ছে বলে? এইগুলিই কি প্রীতির মুখে হাসি না থাকার কারণ?

: কী বলব ভাই! সবদিন দুমুঠো ভাতও সবার মুখে দিতে পারি না। গেরস্থবাড়িতে আজ তিন দিন উনোনে আঁচ পড়ে না। অথচ লঙ্গরখানায় গিয়ে লাইন দেব তাও পারি না। বাড়ি বাড়ি ভিক্ষে করব তারও যো নেই। আমরা যে ভদ্দরলোক ভাই! শরীর খারাপ বলে নিজে কতদিন না খেয়ে কাটাই। আজকাল উনিও আমার পথ ধরেছেন। আমি বুঝি, সব বুঝি, কিন্তু বুঝেও কী করব! মানুষটার দিকে চাইলে আমার কান্না পায়। দেবতার মত মানুষের এ কি দুর্গতি।—বলতে বলতে ডুকরে ডুকরে কেঁদেছিল মুখুজ্যে-গিন্নি।

প্রীতির যদিও তেমন অবস্থা এখনও হয়নি, তবে হবে—ভবিষ্যতের এই আশঙ্কাতেই প্রীতির মুখে হাসি না থাকতে পারে তো? শীলাদি না বলত অতীত নিয়ে ভাবতে নেই, ভাবতে হয় বর্তমান নিয়ে ভবিষ্যৎ নিয়ে?

'বৌদি, আমার কথার কিন্তু জবাব দাওনি।'

জলজ্যান্ত এই কারণটার কথাই বলবে?

: খবর্দার! বাইরের খবরাখবর ও যেন কিচ্ছু না টের পায়। হেমন্ত ছাড়া ওর ঘরে যেন কেউ না ঢোকে। কটা দিন সবুর করো, উইলের একটা হিল্লে করি, তারপর যা হয় হবে।—অনাদির হুঁশিয়ারি মনে পড়ে যায়।

ভাগ্যিশ মনে পড়ে যায়। কবি মানুষ, বড্ড নরম মন, বলা যায় না, দুনিয়ার হালচাল টের পেলে হয়ত মানুষের জন্যে দরদ উথলে উঠবে, সবকিছু দানখয়রাত করে বসে থাকবে।

প্রীতির অবস্থা তাহলে কী হবে?

'বৌদি!'

'বুঝেছি!' মুখে প্রীতি হাসি ফোটায়। 'শুধু কবিতার নায়িকাকে নিয়ে আর চলছে না, এবার একটি—।' মুখ টিপে টিপে হাসে: আরও হাসতে হবে? এমন রসিকতার পরেও হাসির দরকার আছে?

'আমাকে তাহলে তুমি আজও চেননি বৌদি।'

'তাই নাকি!' প্রীতির এবার নির্ভেজাল হাসি পায়: যাত্রার রাজপুত্তুরকে না চেনার জন্যে যেন বুক প্রীতিলতার ফেটে যাচ্ছে!

অতীত থেকে বর্তমান। সাধ্য কি এই বর্তমানে দাঁড়িয়ে অতীত আঁকড়ে পড়ে থাকে।

রাস্তার দিকের জানালাটা প্রীতি সব সময় বন্ধ করে রাখে।

অথচ ঘরের প্রতিটি জানালা দরজা খোলা না থাকলে অনিমেষের যেন হাঁফ ধরে যায়।

'তুমিও দেখছি মেজদার পথ ধরলে। মেজদার চৌহদ্দি একখানা ঘর, তোমার বাড়ি—এই যা তফাত।'

'ওই জানালাটা খুলো না ঠাকুরপো—খুলো না খুলো না।'

জানালা খুলে দেয় অনিমেষ। বলে, 'তোমার এ-দুঃখের কোন মানে হয় না। জানোয়ারের দল জানোয়ারের মত মরবে—এতে দুঃখের কী আছে।' অনিমেষ রাস্তার দিকে চেয়ে থাকে। 'দেশে তোদের কী এমন সব রাজ্যপাট ছিল যে এককেজন আট-দশটা করে পয়দা করেছিস। দুর্ভিক্ষ না হলে এগুলো না খেয়ে মরত, খেতে পেলে অমানুষ হয়ে থাকত।' অনিমেষ ফিরে তাকায়। 'যাদের ছেলেমেয়ে মানুষ করার ক্ষমতা নেই কিন্তু বছর বছর জন্ম দেয়—তারা ক্রিমিনাল।'

মুহূর্তে মুখখানা প্রীতি কঠিন করে তোলে: কী বলতে চায় ও? এই যুদ্ধের বাজারেও অনাদির বাঁধা রোজগার নেই, আজও সে চাকরি না করার পণ ধরে আছে, অর্ডার সাপ্লাইয়ের মাঝে উঞ্ছবৃত্তি করছে, অথচ বছর বছর প্রীতি মা হচ্ছে—সেই নিয়ে খোঁটা? অমন করে তার দিকে

চেয়ে আছে কেন? তার কথার মানেটা ধরতে পেরেছে কিনা যাচাই করে নিচ্ছে? প্রীতি চুপ করে থাকলে ধরতে পারেনি মনে করে স্পষ্টই বলবে?

যদি বলে, প্রীতিও আজ ছেড়ে কথা কইবে না। প্রথমবার মা হওয়ায় অনিমেষ যেমন খুশী হয়েছিল, দ্বিতীয়বার তেমনি মুখ গোমড়া করে। ঝিনুকে ভুলেও কখনো ছোঁয় না। সঙ্গে সঙ্গে রানুকেও। যেন ভাইঝিদের খানিক আদর করলেই তাদের দায়দায়িত্বও ওর ঘাড়ে গিয়ে পড়বে। এই বয়সেই কী হিসেবী!

হিসেবী! হিসেবী কি প্রীতিও হতে পারত না? বারবার অনাদি ভাইয়ের টাকায় ব্যবসায় নামার কথা বলেনি? নিজের বাপকে যে পাগল বানাবার ব্যবস্থা পাকা করে এনেছিল, ভাইয়ের টাকাগুলি গায়েব করা কি তার পক্ষে এতই শক্ত হত?

প্রীতি তখন বাধা না দিলে কী অবস্থা আজ হত অনিমেষের?

কিন্তু প্রীতি বাধা দিয়েছিল কেন? শ্বশুরের জন্যে? হেমন্ত সেই বুড়োকে কথা দিয়েছিল বলে দিনের পর দিন একজনের সঙ্গে প্রতারণা করে চলেছে, প্রীতি কথা দিয়েছিল বলে আরেকজনের সঙ্গে সততা বজায় রাখছে? কাজটা দু রকমের হলেও কারণ একই?

হেমন্ত সেই বুড়োর টাকায় মায়ের রোগ সারিয়েছে, দুই বোনের বিয়ে দিয়েছে—বুড়োর প্রতি তার কৃতজ্ঞ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু প্রীতির? প্রীতিকে সেই বুড়ো কি দিয়ে গেছে?

উল্টোপাল্টা ভাবনায় প্রীতি দিশেহারা হয়ে পড়ে। মনে হয়, অনর্থক সে অনিমেষের ওপর রাগ করছে। অনর্থক। যার নিজের কাজের মাথামুণ্ডু নেই—পরের দোষ সে ধরে কী করে!

'বোসো ঠাকুরপো।' প্রীতি মিষ্টি করে বলে। 'কড়াইশুটির কচুরি খেতে চেয়েছিলে, আজ করি, কেমন?'

'উঁহু, আমায় এক্ষুণি যেতে হবে—ক্লাস আছে। হ্যাঁ, তোমায় যে কথা বলতে এসেছিলাম—দাদার কাণ্ড শুনেছ? অপারেশনের ব্যাপার? তোমাকেই বলে নি? সেকি! অথচ সুব্রতকে দিয়ে ডাক্তার রুদ্রের সঙ্গে ব্যবস্থা করে ফেলেছেন—এবার ডেলিভারির সময় তোমার অপারেশন করাবেন।'

'মানে!'

'আমারও শুনে খারাপ লেগেছে। বছর বছর ছেলেপুলে হওয়া ভালো নয় মানি, সেজন্যে সাবধান হলেই হয়। অপারেশনটা বাড়াবাড়ি। রিস্কিও।'

'নার্সিং হোমে আমি গেলে তো।'

'যাও, যেতে কি। তুমি যদি আপত্তি করো—'

আপত্তি! কী আসে যায় প্রীতির আপত্তিতে? প্রথমবার অত তাড়াতাড়ি মা হওয়ায় আপত্তি সে করেছিল। শীলাদির মতই বেঁকে দাঁড়িয়েছিল। শীলাদি আপত্তি করেছিল তার ইশকুলের কথা তুলে, প্রীতি আপত্তি করে সংসারের কথা তুলে। সে-ও শীলাদির মতই বাপের বাড়ি চলে গিয়েছিল।

কিন্তু কী হল শেষ পর্যন্ত? শীলাদি স্বামী ছেড়ে এলেও বাপের বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছিল, শীলাদির মা বাবা দুই দাদা তাকে আদর করে রেখেছিল। আর প্রীতি গিয়ে তিন দিনও থাকতে পারেনি: কী সর্বনাশ! স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে চলে আসে! নতুন মা একরকম জোর করেই তাকে পাঠিয়ে দেয়। বাবা নিজে এসে দিয়ে যায়।

নেই। স্বামী ছাড়া প্রীতির গতি নেই। স্বামীর ইচ্ছের মুখ চেয়ে চলা ছাড়া উপায় নেই।

প্রীতিরও রোখ চেপে যায়: দেখা যাক ওই ইচ্ছের দৌড় কতদূর! প্রথমবার জোর করে সে একমাস হাসপাতালে ছিল। থাকার নিয়ম নেই? টাকা খরচ করলে আবার নিয়ম নেই! দ্বিতীয়বারও থাকত, নেহাত হাসপাতাল থেকেই আপত্তি হতে পারেনি।

এবার সে তাই আগে থেকে জিদ ধরে রেখেছিল—হাসপাতাল নয়, নার্সিং হোমে যাবে।

এক কথায় রাজী হয়ে যায় অনাদি। অনাদির মনে তবে এই মতলব ছিল? তিনটির বাপ হতে হতেই দম ফুরিয়ে গেছে লোকটার!

'আমার জন্যে তুমি হাসপাতালে গেলে না!' চোখ চকচক করে অবনীর।

'বিশ্বাস হচ্ছে না ?'

'বিশ্বাস করতেই তো প্রাণ চায়—'

'তবে করছ না কেন ?'

'তোমায় দেখে। তুমি তো কাউকে ভালোবাসো না।'

'ভালোবাসি না !'

'বৌদি, তোমাকে কেউ বোঝে না, আমি বুঝি। কেন জানো ? তোমার মধ্যে আমি নিজেরই শৈশবকে দেখতে পাই। আমাদের দুজনের মধ্যে অদ্ভুত কয়েকটা মিল আছে—অনেক অমিল থাকলেও। এ এক আশ্চর্য যোগাযোগ ! কাল যখন শুনলাম তুমি তোমার বাবাকে—'

'হেমন্তবাবু এসে লাগিয়েছেন ?'

'হেমন্তর দোষ নেই। আমিই ওর কাছ থেকে কথা বার করে নিয়েছি।'

'কিন্তু জামাইয়ের কাছে যদি বারবার এসে হাত পাতেন—'

'সম্ভব হলে দেবে, নইলে দেবে না। তার জন্যে ওসব কথা বলার, ওঁকে ওভাবে অপমান করার দরকার পড়ে না। কাজটা কিন্তু ভালো করোনি বৌদি।'

ভালো করোনি ! মনে মনে মুখ ভেঙায় প্রীতি। ভালো-মন্দর উপদেশ কি শেষ পর্যন্ত এর কাছ থেকে নিতে হবে ? যাত্রার দলের এই রাজপুত্তুরের কাছ থেকে !

'বৌদি, নিজের মা বাবাকে যারা ভালোবাসতে পারে না পৃথিবীর কাউকে ভালোবাসাই তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। অথচ ভালো যদি না বাসতে পারো জীবন অর্থহীন হয়ে উঠবে, বাঁচার প্রেরণা পাবে না। আমিও তোমার মত ভুল করতে বসেছিলাম, শেষ পর্যন্ত—'

'তোমার কবিতার ছন্দ বুঝি আজ মিলছে না ঠাকুরপো ?'

'কবিতার ছন্দ কি আপনা-আপনি মেলে বৌদি, চেষ্টা করে মেলাতে হয়। শুধু দেখতে হয় পাঠক যেন সেই চেষ্টার পরিচয়টা না পায়। তেমনি জীবনের ছন্দ। আপনা হতে কিছুই হয় না, মানুষকে—'

'আমি মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, ও-সব বড় বড় কথা—'

'কিন্তু তোমার আচার-আচরণ তো মুখ্যুসুখ্যুর মত নয়? একেক সময় একেকটা কথায় আমাকেও তুমি চমকে দাও।'

'বুঝেছি! বৌদি হওয়ার উপযুক্ত আমি নই। ছোটঠাকুরপোও বলে, বৌদিরা কত হাসিখুশি হয়, ঠাট্টাইয়ার্কি করে, সমবয়সী বন্ধুর মত—'

'ভুল করছ, ছোটকার মত আমার মত নয়, ছোটকার মন আমার মন নয়।'

'তবে বৌদি নয়, তোমার একটি বউ দরকার?'

'ঠাট্টা করছ?'

'ঠাট্টা! বিয়ে করাটা ঠাট্টা!'

'বউয়ের আমার প্রয়োজন নেই।'

'কিন্তু একটি মেয়ের প্রয়োজন মিটত। একটি মেয়ের বাপের দুর্ভাবনা ঘুচত।'

'তুমি বড় বাঁকা বাঁকা কথা বলো।'

'সত্যি কথা বলি।'

'সত্যি! যে-সত্যি মনকে শুধু দুঃখই দেয় কী লাভ সেই সত্যিকে আঁকড়ে থেকে?'

'সত্যিকে কি নিজের খুশিমত গড়েপিটে নেওয়া চলে?'

'কেন নয়। বাঁচতে হলে নিতে হয়। জীবনে বাঁচার দুটি পথ খোলা—এক জীবনের হাতে নিজেকে সঁপে দাও, চোখ বুজে ভেসে যাও, কোন প্রশ্ন তুলো না, কোন সংশয়কে মনে স্থান দিও না। জীবন তোমাকে যেখানে নিয়ে যায়, যাক। দুই জীবনের কাছ থেকে নিজের প্রয়োজনটুকু নিয়ে নাও, নিজের প্রয়োজন মত বেঁচে থাক। তার জন্যে যদি জীবনের পনের আনাও বাদ দিতে হয়, দাও। আমি যদি বিকলাঙ্গ না হতাম তাহলেও এই ভাবে বাঁচতাম। পৃথিবীতে এমন কিছু লোক থাকে বৌদি, নিজেদের যারা জীবনের হাতে অনায়াসে সঁপে দিতে পারে না, পাঁচজনের একজন হয়ে থাকতে পারে না—এভাবে বাঁচা ছাড়া তাদের উপায় নেই। দরকার হলে নিজের সত্তাকে দুভাগে ভাগ করে নিয়েও—'

'বললাম না তোমার এসব বড় বড় কথা আমি বুঝিনা ঠাকুরপো।'

বুঝিনা, না বুঝতে চাইনা? মাঝে মাঝে প্রীতির মনে হয়ঃ বুঝতে চাইলে ক্ষতি কি?

নিজেকে দুভাগ করে বাঁচা প্রতারণা? কী আসে যায় সেই প্রতারণায়? এই যে দিনের পর দিন হেমন্ত থেকে সবাই প্রতারণা করে চলেছে একজনের সঙ্গে, ক্ষতি হওয়ার বদলে ওতে কি ওর লাভই হচ্ছে না? কবিতায় নায়িকা নিয়ে তাই না অমনভাবে মশগুল হয়ে থাকতে পারছে?

ভালোবাসার জন্তেই নাকি এমনটা সম্ভব হয়েছে। ভালোবাসা! এই পৃথিবীর আলো হাওয়া থেকে শুরু করে নগণ্যতম জিনিসটিকেও কবি ভালোবাসে।

ভালোবাসার এমনই যাদু যে ভালোবাসার চোখ দিয়ে যা দেখবে তাই ভালো লাগবে।

'বৌদি, মানুষের সবচেয়ে জোরালো প্রবৃত্তি দুটি—ভালোবাসা আর ঘৃণা। জীবনে যদি আনন্দ চাও—ভালোবাসো। পরকে ঘৃণা করলে নিজের জীবনই অসহ্য হয়ে উঠবে।'

ভালোবাসা আর ঘৃণা! সবাইকে প্রীতি ঘৃণা করে আবার ভালোও বাসতে হয়। ভালোবাসার অভিনয় করতে হয়। তাই কি প্রীতির জীবন অসহ্য হয়ে উঠেছে? ঘৃণাটাই এখানে নিখাদ বলে? ভালোবাসলে হত না?

কেন প্রীতি ভালোবাসতে পারছে না? তিন তিনটি মেয়ে তার। আর কাউকে না হোক নিজের সন্তানদের তো ভালোবাসতে পারে? মার অন্তত পারা উচিত?

ঘুমন্ত তিন মেয়ের দিকে তাকায় প্রীতিঃ স্বামীর ওপর শোধ তুলতে যাদের পৃথিবীতে এনেছে তাদের ভালোবাসা সম্ভব? ঘৃণার পাঁকে ভালোবাসা জন্মায়?

স্বামীর ওপর শোধ তুলতে চেয়েছিল কেন? বাবা যেমন আজ সংসার নিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন, অনাদিকেও তেমনি নাকানিচুবানি খাওয়াবে বলে? বাবার হিমশিম খাওয়াটা চব্বিশ ঘণ্টা চোখে দেখতে না পারার দুঃখ ওই ভাবে ভুলতে চেয়েছিল?

যদিও অনাদির কোন দোষ নেই কিন্তু যেহেতু পৃথিবীতে একজনের কাজের ফল আরেকজনকে ভোগ করতে হয়, তাই ?

'বৌদি, পৃথিবীতে যেমন আলো অন্ধকার দুই-ই আছে, তেমনি মানুষের মধ্যেও ভালো মন্দ—'

উপদেশ উপদেশ আর উপদেশ ! উপদেশ শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে যায়। একেক সময় তীব্র আক্রোশ জেগে ওঠে : দেবে নাকি লোকটাকে হিড় হিড় করে টেনে রাস্তায় বের করে ? কত ধানে কত চাল হয় বুঝিয়ে দেবে ?

অনিমেষ বলে, 'আমি যদি কায়েতের মেয়ে বিয়ে করি তোমার কোন আপত্তি আছে বৌদি ? জ্যোৎস্নাকে আমি ভালোবেসে ফেলেছি।'

ভালোবেসে ফেলেছি ! মনে মনে কেটে কেটে প্রীতি উচ্চারণ করে : কী সহজেই এরা ভালোবাসতে পারে ! মুখ ফুটে বলতে পারলেই ভালোবাসা হয়ে যায়। শক্ত-সমর্থ শরীরটা যদি হাতে থাকে। সকলের তাও লাগে না। আধখানা শরীর নিয়েও কেউ ভালোবাসতে পারে। রক্ত মাংসের মেয়েও তার দরকার হয় না। মনটা মজুত থাকলেই হল।

'তোমার আপত্তি না হলেও দাদা আপত্তি করতে পারে। অবশ্য বিয়ের পর আমি আর এখানে থাকব না।'

অভিনয়ের ধার ধারে না অনিমেষ। বেশি ঘাঁটালে হয়ত বলেই ফেলবে বউ নিয়ে এই পরিবেশে বাস করা তার পক্ষে অসম্ভব। জ্যোৎস্নাই হয়ত রাজী নয় : সুন্দরী, তায় বাপ নামকরা ডাক্তার—দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না মেয়ের। ঘণ্টাখানেকের জন্যে একদিন এসেছিল, প্রীতির ময়লা ব্লাউজের দিকে বার বার তাকিয়েছে, প্রীতির ঘর-সাজানোর সমালোচনা করেছে, অনাদির বিড়ির কৌটো দেখে মুখ বেঁকিয়েছে, চার বছরেই প্রীতির তিনটি মেয়ে হয়েছে শুনে আঁৎকে উঠেছে : কী সর্বনাশ ! এদের মানুষ করবেন কী করে ?

জ্যোৎস্নাই রাজী নয় এ-বাড়িতে এসে থাকতে : আধুনিক আদবকায়দায় মানুষ, শিক্ষিত পরিবারের মেয়ে। সে কী এ-বাড়িতে বাস করতে পারে !

: এই বাড়িটাও কেমন রাক্ষুসে।

এ-বাড়িও পছন্দ নয় জ্যোৎস্নার। ওর মতে সংসার যেমন হবে ছোটখাট ছিমছাম, বাড়িটিও তেমনি।

: বাবা যে কী দেখে এই বাড়ি কিনেছিলেন! একান্নবর্তী পরিবারের পক্ষে এসব বাড়ি মানায়। কিন্তু আজকের দিনে একান্নবর্তী পরিবার যেমন অচল, তেমনি এই সেকেলে বাড়িগুলিও। অনিমেষও বলত। জ্যোৎস্নার কথা শুনেই বলত? কিন্তু জ্যোৎস্না তো আগে এ বাড়ি ছাখেনি? তবে কি জ্যোৎস্না অনিমেষের কথারই পুনরুক্তি করেছে?

যাই করুক, ওরা দুজনেই স্পষ্টবাদী। চমৎকার জুটি।

'তুমি যে কিছুই বলছ না বৌদি?'

'বলার কি আছে ভাই। তুমি এখন সাবালক হয়েছ, যা ভালো মনে কর করবে—'

'আলাদা থাকার মানে কিন্তু সম্পর্ক চুকিয়ে দেওয়া নয়। দেখলাম, আমি যেভাবে থাকতে চাই—'

'তোমার দাদাকে বলো।'

'দাদা হয়ত ভাববে—'

'যাই ভাবুন, তাই বলে সারাটা জীবন পরের মুখ চেয়ে মানুষ চলতে পারে না। সত্যিই তো তোমার সঙ্গে যেমন ওঁর মিল নেই, তেমনি জ্যোৎস্নার সঙ্গেও আমার নেই। তোমার ছেলেমেয়েদের সঙ্গেও আমার ছেলেমেয়েদের থাকবে না। সেক্ষেত্রে একসঙ্গে থাকলে ঠোকাঠুকি হবেই।'

অনিমেষ হঠাৎ ঢিপ করে প্রণাম করে বসে।

'তোমার এত বুদ্ধি বৌদি! তুমি এত বোঝ।'

বুদ্ধি? যাক। প্রীতির বুদ্ধিতে মর্চে তবে আজও ধরে নি।

'এই নাও।'

'বাঃ! কোথায় পেলে?'

'তোমার জন্যে বাগানে লাগিয়েছিলাম, অবাক করে দেব বলে এতদিন বলিনি।'

'এর নাম ব্ল্যাক প্রিন্স।'

'তুমিই তো একদিন বলেছিলে—'

'তোমার মনে আছে? আশ্চর্য! গোলাপ আমার সবচেয়ে প্রিয় ফুল। তার মধ্যে ব্ল্যাক প্রিন্স।'

ফুলের তোড়াটা অবনী গালে চেপে ধরে। চোখ বুজে গভীরভাবে শ্বাস টানে।

ফুল ভালোবাসে কবি। বড্ড ভালোবাসে। কিন্তু কই তার ভালোবাসা তো বুঝতে পারল না এ-ফুল বাগানের নয়, বাজার থেকে কিনে-আনা? নাকি ভালোবাসার এমনই কেরামতি যে বাজারের ফুল তার কাছে বাগানের ফুল হয়ে যায়?

'কাছে এসো।'

প্রীতি এগিয়ে যায়।

'বোসো।'

বসে।

'পেছন ফের। ঘোমটা নামাও—'

'ক্ষেপেছ।' সঙ্গে সঙ্গে প্রীতি উঠে দাঁড়ায়।

'আমি পরিয়ে দিলে আপত্তি? বেশ, তবে নিজেই পরো।'

'কী যে বলো! খোঁপায় ফুল গোঁজার বয়েস আছে আমার, না আমার তা মানায়।'

'বয়েসটা বছরে বাড়ে না বৌদি, বয়েস বাড়ে মনে। অনেকে বিশ বছরে বুড়ো হয়ে যায়, অনেকে আশীতে যুবক থাকে। রবীন্দ্রনাথকে ছাখো—'

'কবিদের কথা বাদ দাও।'

'কবি তো তারাই জীবনের সবকিছুকে যারা সুন্দর দেখে। কেউ সেই দেখাটা ছন্দে লেখে, কেউ সেটা জীবনে সার্থক করে তোলে। বৌদি, সব কিছুর অস্তিত্ব নির্ভর করে তোমার ওপর—তুমি তাকে কী ভাবে গ্রহণ করো। যেমন ধরো ফুল। ফুল দেখে যদি তুমি খুশী হও, ফুল সুন্দর। নইলে ওর সৌন্দর্যের কোন মানে নেই। তোমার দেওয়া এই ফুল আমার

কাছে একটি নতুন কবিতার প্রেরণা। হ্যাঁ, আজই আমি ফুল নিয়ে একটি কবিতা লিখব। তোমাকে নিয়েও লিখব।'

'আমাকে নিয়ে কবিতা?'

'কেন নয়। আমার কাছে তোমার একটি রূপ ধরা পড়েছে, সে-রূপ আমায় মুগ্ধ করেছে। বাস্তবে তার সঙ্গে হয়ত পুরোপুরি মিলবে না, না মিলুক—আমার মুগ্ধ হওয়াটা তো মিথ্যে নয়।'

লিখুক! তাকে নিয়ে কবিতা লিখুক। তার রূপে মুগ্ধ হোক। তখন জানিয়ে দেবে অনিমেষের কাণ্ডটা। নিমকহারাম স্বার্থপর অনিমেষের কীর্তি।

প্রীতির বুদ্ধিতে দেখা গেল, আজও তবে মচে ধরে যায়নি।

অনিমেষ সম্পর্কে মনটা এমনই বিষিয়ে দেবে যাতে জীবনে আর এ-বাড়িতে অনিমেষ কোনদিন না পা দিতে পারে।

অনাদির তাতে মত নেই: একেবারে পর করে দেওয়া ঠিক হবে না। ও নিজে থেকেই যখন সম্পর্কটা রাখতে চাইছে, মাসে মাসে কিছু সাহায্য করতেও রাজী হবে নিশ্চয়।

'তারপর? সংসার চলবে কিসে? তুমি তো আজও একটা পাকাপাকি কিছু করতে পারলে না। সেই চাকরিটা যদি নিতে—'

'কারো তাঁবে কাজ করতে আমি পারব না।'

'তবে করবেটা কি! এটা না ওটা না সেটা না। এই করে এতগুলি বছর কাটল। আজকালকার দিনে কী করে আমি সংসার চালাই খেয়াল রাখ! ভাবনাচিন্তায় আমার—'

'একটা ভাবনার হাত থেকে তো তোমায় রেহাই দিয়েছি।'

'কিন্তু যে-তিনটি আছে?'

'তুমি কি ভাব মেয়েদের ভাবনা শুধু তোমার? আমার কোন ভাবনা চিন্তা নেই?' অনাদি চটে যায়। 'আমি গায়ে হাওয়া দিয়ে বেড়াচ্ছি? সারা দিন টো টো করি অন্নি অন্নি? হাজার আষ্টেক টাকা হলে কবে আমি রাম কালোয়ারের পার্টনার হয়ে যেতে পারতাম। লোহায় কাঁচা টাকা। কিন্তু তোমার জন্যেই—'

'তাই বলে ভাইয়ের টাকা ভাঙবে!'

'ভাই!' অনাদি গলা চড়ায়। 'ভাই যে লায়েক হয়ে এখন কল দেখিয়ে চলে যাচ্ছে—তার কি! অত সতীত্ব বাঁচিয়ে আজকের দিনে সংসার করা চলে না। দু বছর না হয় ওর পড়াশোনা বন্ধ থাকত। তারপর ফের শুরু করত। আমি তখন হয়ত ওকে বিলেত পাঠাতেও পারতাম। দেখতে, সবকিছুর ক্ষতি পূরণ হয়ে যেত। তোমার বুদ্ধি শুনেই এই দুর্গতি!'

বুদ্ধি! অনাদিই না একদিন তার বুদ্ধির তারিফ করত! কদিন আগেই অনিমেষ করেছে? প্রীতি নিজেও না সেটা গতকাল যাচাই করে নিল?

তবে কি প্রীতির বুদ্ধির নিজস্ব কোন দাম নেই—যে যেমন ভাবে সেটা দেখে তার ওপরই তার দাম? তার বুদ্ধির অস্তিত্ব নির্ভর করে পরের ওপর?

'বেশ! আমার গয়না নাও, তাই দিয়ে—'

'নেব। তুমি না বললে আমিই চেয়ে নিতাম। তবে খালি হাতে নয়। তার বদল তুমি পাবে—অনেক বেশিই পাবে।'

অনাদি ঘরের দরজা বন্ধ করে। আলমারি খোলে। আলমারির ডালা টানে। লম্বা একটা খাম বের করে।

'কী ওটা?'

'উইল।'

'উইল?'

'হ্যাঁ, মেজকার উইল। সে সজ্ঞানে এই বাড়ি তোমায় দান করে দিয়েছে, নাটু দত্ত সাক্ষী। সাকুল্যে এর দাম কত জানো? কম করেও পঞ্চাশ হাজার। পঞ্চাশ হাজার টাকার সম্পত্তির বদলে আমায় হাজার আষ্টেক টাকার গয়না দিতে নিশ্চয় তোমার আপত্তি হবে না। এই গয়নাও আমি ধার হিসেবে নিচ্ছি। আশা করি বছর খানেকের মধ্যেই সুদে আসলে—'

'মেজ ঠাকুরপো উইল করেছে? কই আমায় তো কিছুই—'

'বলেনি তো?' অনাদি মিটি মিটি হাসে।

'বুঝেছি! এই উইল—'

'আস্তে কথা বলো!'

'তুমি—তুমি শেষ পর্যন্ত—?'

'বেশ করেছি! বেশ করব!' অনাদি উত্তেজিত হয়ে ওঠে। 'ভালোমানুষের স্থান দুনিয়ায় নেই। চারপাশে তাকিয়ে দেখছ না। সমাজের যারা মাথা, খোঁজ নিয়ে দেখ, তারা সবাই কী ভাবে ওপরে উঠেছে। আমার বাবার নামে সবাই কপালে হাত ঠেকায়। কিন্তু আমার বাবা নোটজাল করে টাকা জমিয়ে সেই টাকায় কারখানা করেছিল। চুরি জুয়াচুরি ধাপ্পাবাজি ছাড়া আজকের দিনে বাঁচার পথ আছে?'

সত্যি কথা! খুব সত্যি কথা! প্রীতির সমস্ত মন সায় দিয়ে ওঠে। কিন্তু—মন তবু কিন্তু কিন্তু করে।

'এই উইলের মানে অবশ্য এই নয় যে—', অনাদি যেন সেটা টের পায়, বউকে তাই প্রবোধ দেয়, 'মেজকাকে বিষ খাইয়ে সম্পত্তি বাগিয়ে নেব। এটা ভবিষ্যতের পথ বেঁধে রাখা। ওর অবর্তমানে পাছে ছোটকা—'

'কিন্তু আসল উইল তো—'

'সে-সব ব্যবস্থা করতে হবে। আমিই করব। তুমি শুধু দেখ। ও ওর কবিতা লেখা আর বই পড়া যেমন চালিয়ে যাচ্ছে চালিয়ে যাক, ওর রাজভোগ যেমন চলছে চলুক।'

উইলটা আলমারির মধ্যে রেখে অনাদি স্বগতোক্তি করে, 'এ কাজ আমি করতাম না। ছোটকার জন্যে করতে হল। যার জন্যে এত করলাম সেই ছোটকা আলাদা হয়ে যাচ্ছে। যাক! যে যা ভালো বোঝে করুক। যে যার নিজের ভালো দেখুক। দুনিয়ার নিয়মই এই।' একটু থেমে অনাদি ফের বলে, 'মেজকার জন্যেও তুমি কী-না করছ, কিন্তু ও-ও যদি পথে বসায়? জ্যোৎস্না তোমার চেয়ে সুন্দর, বয়েস অল্প, তোমার সঙ্গে ভালোভাবে কথা না কইলেও ক-মিনিটেই নাকি কাব্যটাব্য নিয়ে ওর সঙ্গে জমিয়ে ফেলেছিল —তুমিই বলেছ—শেষ পর্যন্ত ওরই নামে যদি—কবি মানুষ—বলা তো যায় না।'

অনাদি হাসে।

হাসলে মানুষকে যে এত কুৎসিত দেখায় প্রীতি জানত না।

'আর তোমাকেও বলি—দিনকে দিন কেমন ল্যাদাভ্যারাস মেরে যাচ্ছ।

সংসারে অভাব-অনটন আছে, ভাবনাচিন্তা 'আছে মানি, কিন্তু আমাদের চেয়েও কি অভাবী সংসার নেই? তারিণীর কী অবস্থা? অনিলের কী অবস্থা? কিন্তু কই, ওদের বউরা তো তোমার মত দিনরাত মুখ হাঁড়ি করে এমন অগোছাল হয়ে থাকে না। কেষ্টর সাতটা ছেলেমেয়ে, অথচ বাইরে থেকে ওর বউকে দেখলে—তুমিও যদি ব্লাউজের নিচে ইয়ে—।'

কথা শেষ না করে বউকে অনাদি বুকে টানে। বউয়ের গায়ে হাত বুলিয়ে আদরটাদর করে, চুমোটুমো খায়।

বেলা দশটায় স্বামীর সোহাগ উথলে উঠল কেন? তার রূপ নিয়ে বেফাঁস বলে ফেলল বলে? পরের কাছে তার দেহটার কোন দাম না থাকলেও তার কাছে আজও আগের মতই লোভনীয় আছে জানান দিতে?

দেহ আর মন। একজন বলে দেহটাকে সাজিয়ে গুছিয়ে তুলে ধরো, আরেকজন বলে দেহের দাম আর কতটুকু, কদিনের! মানুষের দেহের রূপ একদিন ঝরে পড়বে, হাজার চেষ্টা করেও দেহের যৌবনকে তুমি ধরে রাখতে পারবে না—কিন্তু মনের যৌবনকে পারবে।

'তুমি ভাবছ আমার কথাটা ঠিক আঙুর ফল টকের মত হয়ে গেল, না?'

'আঙুর ফল টক?'

'সে গল্প জানো না? সেই যে এক শেয়াল—'

'ছি। তা ভাবব কেন।'

'ভাবতে পার। ভাবা কিছু অন্যায় না। দেহটা যার বাতিল হয়ে গেছে মন নিয়ে সে মাতামাতি করবে—স্বাভাবিক।'

বাতিল! কে বলে বাতিল। পায়ের দিকে না তাকালে ওই ভরাট মুখ, চওড়া বুক, ভারী কাঁধ দেখে কে বুঝবে লোকটা বিকলাঙ্গ। একদিন হাত চেপে ধরেছিল, মনে হলে আজও কব্জিটা টনটন করে। নিজে থেকে ছেড়ে না দিলে সাধ্য ছিল প্রীতির ছাড়িয়ে নেওয়ার?

অথচ আস্ত পুরুষ অনাদি। কী অনায়াসে তার কবল থেকে নিজেকে প্রীতি মুক্ত করে নিতে পারে। ইচ্ছে করলেই পারে।

যদি ইচ্ছে করে।

'বৌদি, মনের যৌবনকে বাঁচিয়ে রাখার একমাত্র উপায় ভালোবাসা। ভালোবাসা মানে কি শুধু নারী পুরুষের ভালোবাসা? তা কেন। তোমার মধ্যে যদি ভালোবাসা থাকে পৃথিবীর সবকিছুকে তুমি ভালোবাসতে পার। আলো, হাওয়া, ফুল, গাছ, পাতা, নদী, বন, ক্ষেত, পাখি—কী নয়। ভালোবাসতে চাইলে—'

সেই পুরনো কাসুন্দি: ভালোবাসা ভালোবাসা আর ভালোবাসা! প্রীতিকে বার বার একথা শোনাবার মানে? ভালোবাসতে চাইলে সব কিছুকে ভালোবাসা যায়—আধখানা একটা মানুষকেও? এটা তারই ভূমিকা?

'বৌদি, পৃথিবীতে দুঃখকষ্ট আছে, চিরকাল ছিল, থাকবেও—'

ওমা! এ যে প্রায় অনাদির কথারই প্রতিধ্বনি: হাজার অভাব-অনটনের মধ্যেও মুখের হাসিটি বজায় রাখো, সেজেগুজে পরীটি হয়ে থাক। মনে যাই হোক বাইরের লোকে যেন তা টের না পায়।

বাইরের লোকে যদি টের না পায় তাহলে আর তোমার দুঃখের অস্তিত্ব কি?

শুধু দুঃখ কেন, পরে না জানলে কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই। পনের বছর থেকে যে বাবাকে সে ঘৃণা করে এসেছে বাবা জানতেন? সেদিন তাঁকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার সময় মুখ ফুটে সে কথা না জানিয়ে দিলে জানতে পারতেন?

অথচ বাবার প্রতি ঘৃণাটা তো নিজের অস্তিত্বের মতই তার কাছে সত্যি ছিল এতদিন।

যেমন বাবার প্রতি ঘৃণা তেমনি আর সকলের প্রতি না-ভালোবাসা। কিন্তু যেহেতু প্রীতি সেটা কখনো জানান দেয়নি তাই আজও তার হদিশ পায়নি কেউ।

যদি পেত! তাহলে কী করত অনাদি? অনিমেষ? ওই লোকটা?

সকলের সঙ্গে প্রীতি প্রতারণা করে চলেছে? হেমন্তর মতই? হেমন্ত যেমন তার বন্ধুর সঙ্গে করছে?

কিন্তু হেমন্তর তো সেজন্যে মনে কোন জ্বালা নেই। কী অনায়াসে

ও-ঘরে গিয়ে ঢোকে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটায়! ওখানে এক হেমন্ত, বাইরে এক হেমন্ত—আসলে একই হেমন্ত।

হেমন্ত বলে কবি-মন্দির। ঠাট্টা করেই বলে। বলে, 'মন্দ লাগে না কিন্তু। লোকে যেমন মাঝে মাঝে চেঞ্জে যায়, আমিও তেমনি সপ্তাহে একটা দিন ঘণ্টা কয়েকের জন্যে এখানে কাটিয়ে যাই।' বলে আর হাসে।

কথার পিঠে কথা বলার মত প্রীতিও সেই হাসিতে সায় দিয়ে এসেছে। মানেটা তলিয়ে না বুঝেই।

আজকাল যেন মানেটা একটু একটু বুঝতে পারে। আগে ও-ঘরে যেত নেহাত কর্তব্যের তাগিদে, এখন যেন মন্দ নেহাৎ লাগে না। কথাগুলি ওর একঘেয়ে ও অর্থহীন হলেও শুনতে ভালোই।

যতক্ষণ ও-ঘরে থাকে মনে হয় আলাদা একটা জগতে রয়েছে। প্রীতির অতি-চেনা অতি-জানা জগতের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। তবুও ওই জগৎটা মিথ্যে নয়। একজন অধিবাসী অন্তত আছে ওই জগতের। প্রীতির চেয়ে, প্রীতির পরিচিত প্রতিটি মানুষের চেয়ে অনেক সুখে আছে।

'বৌদি, প্রথম যেদিন আমার অবস্থা আমি টের পেলাম—আমি কেঁদে ছিলাম। মনে পড়ে, নার্সিং হোমে সারা রাত গুমরে গুমরে কেঁদেছিলাম জন্মের মত অথর্ব হয়ে গেলাম! এর পর আর বেঁচে লাভ! কী কর বেঁচে! কিন্তু পরে বুঝলাম—দুটো পা থাকাই বড় কথা নয়। কেনন পুরুষকারের কোন মানে নেই। আমরা সবাই নিয়তির পুতুল। আমা বাবার কথা ভেবে দেখ।'

নিয়তির পুতুল? মানুষ মাত্রেই নিয়তির পুতুল? প্রীতির বাবাও প্রীতির নতুন মাও? প্রীতিও? নিয়তির পুতুল বলেই তাদের কোন কাজে জন্যে তারা দায়ী নয়? নিয়তির পুতুল অনাদি? অনিমেষ?

'নিয়তির পুতুল হওয়ার মস্ত সুবিধে মেজ-ঠাকুরপো—কোন কাজে ঝক্কি থাকে না।'

'কথাটাকে তুমি ওভাবে নিচ্ছ কেন। মানলাম, মানুষ ইচ্ছে কর অনেক কিছু করতে পারে, কিন্তু সব কিছু নয়। একটা জায়গায় এসে মানুষ

অসহায় হয়ে পড়তে হয়, একেকটা ঘটনা মানুষের সমস্ত ইচ্ছাকে বানচাল করে দেয়। কিন্তু কেন এমন হয়? নিয়তি ছাড়া একে কী বলব?'

'মনকে সান্ত্বনা?'

'ধরো তাই। সান্ত্বনা শব্দটা শুনতে খারাপ, কিন্তু ওটার প্রয়োজনের সীমা নেই। আজ তো আমার মনে হয় পা কাটা গেছে বলে আমার ভালোই হয়েছে। কারণ আমার মন নিয়ে এ-জগতে চলতে গেলে পদে পদে আমায় হোঁচট খেতে হত। কিন্তু এখন আমি—জানো, আমার চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে হয় আমি সম্রাট! —তুমি হাসছ বৌদি?'

'কে বলল হাসছি!'

'নিশ্চয় হাসছ। তুমি ভাবছ আমার মাথায়—'

'এই ত্যাখ!'

'বুঝেছি। যাও—যাও তুমি ঘর থেকে।'

জোর করে প্রীতির হাত সরিয়ে দেয় অবনী। প্রীতিকে ঠেলে দিয়ে পাশ ফিরে শোয়।

হাসিটা ভুল হয়ে গেছে। ওসব কথার মাঝখানে হেসে ফেললে মানুষ মাত্রেই, নিজেকে সে নিয়তির পুতুল মনে করুক চাই না-করুক, ক্ষুণ্ণ হয়। ক্ষুণ্ণ হয়, অভিমান করে। সুতরাং রেগে গিয়ে ঘর থেকে তাকে বেরিয়ে যেতে অবনী বলতে পারে। ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতেও।

কিন্তু যেতে বললেই প্রীতি যায় কী করে? ধাক্কা দিলেই সরে যেতে পারে? প্রীতি কি হেসেছে ওর কথা শুনে? প্রীতির খোঁপায় আজ বেল ফুলের মালা। প্রীতির আজ নায়িকার বেশ। নীলাম্বরীতে যদিও তাকে মানায় না কিন্তু ওর কবিতায় না নীলাম্বরীর কথাই আছে?

নিজের হাতে অনিমেষকে বরবেশে সাজিয়ে দিয়েছে। সাজিয়ে দিয়েছে রানুকে, মিনুকে, টুনুকে। অনাদির ধুতি-পাঞ্জাবি গিলে করে দিয়েছে, জুতো মুছে দিয়েছে। সদর পর্যন্ত সবাইকে এগিয়ে দিয়ে এসেছে।

'তুমিও এলে পারতে বৌদি। কিছুক্ষণের জন্যে অন্তত—' অনিমেষের কথায় মধুর হেসেছে: প্রীতির গেলে চলে!

বাড়িতে এখন প্রীতি একা। উৎসবের বাড়িতে একা!

প্রীতির মনে পড়ে যায় আরও একটি উৎসবের দিনের কথা: আজকের ছাব্বিশ বছরের প্রীতি সেদিন পনের বছরের। বিয়ের দিনকয়েক আগেই এক খুড়তুতো বোন, দুই মাসী, তিন মাসতুতো ভাই, এক ভাই-বউ এবং বেশ কয়েকটি কাচ্চাবাচ্চা এনে বাড়ি বোঝাই করেছিলেন বাবা। উৎসবের আব-হাওয়া তৈরি করেছিলেন।

সেই উৎসবের বাড়ি থেকে প্রীতিকে চলে যেতে হয়েছিল শীলাদিদের বাড়ি। বাবার সেই খুড়তুতো বোনই নিজে গিয়ে রেখে এসেছিল: বাপের বিয়ে দেখতে নেই।

শীলাদিদের বাড়ির সবাই তাকে প্রবোধ দিত। যে কদিন ছিল সব সময় সমস্বরে তার বাবার নিন্দা করত। তারই জন্যে শীলাদিদের বাড়ি থেকে কেউ নেমন্তন্ন খেতে যায়নি।

কিন্তু কদিন প্রীতি পরের বাড়িতে থাকবে? আবার তো ফিরে যেতে হবে? বাপের বিয়ে না দেখলেও বাপের বউকে মা বলে ডাকতে হবে? ছেলেমেয়ের পক্ষে বাপের বিয়ে দেখার নিয়ম না থাকলেও বাপের বিয়ে করার নিয়মটা যখন আছে।

আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে, নিয়মমাফিক বিয়েটা বাবার ঠিকই হল, তবে বউ নিয়ে আর আসা হল না? রাস্তায় মারাত্মক রকমের কোন অ্যাক-সিডেন্ট হয়ে—

পারে, পারে। অ্যাকসিডেন্ট হতে পারে। অ্যাকসিডেন্টে কত কী না হতে পারে।

সত্যিই যদি অ্যাকসিডেন্ট হয়? সত্যিকারের অ্যাকসিডেন্ট হয়?

খুশির তোড়ে বুকখানা সেদিন থরথর করে উঠেছিল।

মানুষের ইচ্ছেমত অ্যাকসিডেন্ট ঘটে না, প্রীতি জানে। এ-রকম অ্যাক-সিডেন্ট ঘটবে না, তাও জানা। তবু যে-চারদিন শীলাদিদের বাড়িতে ছিল কাল্পনিক ওই অ্যাকসিডেন্টের চরম পরিণতিটার কথা ভেবেই সব ভুলে থাকত।

আজ কিন্তু বেয়াড়া আওয়াজ করে অনাদিদের গাড়িটা স্টার্ট নেবার সময়

লাফিয়ে উঠলে প্রীতির বুকটা হঠাৎ ধক করে ওঠে : এই তো কদিন আগেই, অনিমেষ বলছিল; কোন্ রাস্তায় যেন দুমুখী দুটো ট্রামের মাঝখানে পড়ে একটা ট্যাক্সি চিড়ে-চ্যাপটা হয়ে যায়। ট্যাক্সিতে পাঁচজন ছিল, তিনজন মারা যায় সঙ্গে সঙ্গে, দুজনে হাসপাতালে গিয়ে।

পাঁচজন! অনাদিদের গাড়িতেও তো পাঁচজন—অনাদি, রাণু, মিনু, টুনু, এবং ড্রাইভার!

ধরো, যদি সত্যিই তেমন কিছু ঘটে, প্রীতি তাহলে কী করবে? পনের বছরের প্রীতি যখন বাবার মৃত্যু কল্পনা করেছিল, নিজের ভবিষ্যৎ ভাবেনি। ভাবার কথা মনেও হয়নি।

কিন্তু ছাব্বিশ বছরের প্রীতি, তিনটি মেয়ের মা প্রীতি কি আজ ভবিষ্যৎ না ভেবে পারে!

বাপের বাড়িতে গিয়ে থাকার উপায় নেই, নিজের পায়ে দাঁড়াবার সাধ্য নেই।

সুতরাং এখানেই থাকতে হবে। আধখানা ওই মানুষটিকে নিয়ে। সারাটা জীবন ওরই ফাই-ফরমাশ খেটে কাটাতে হবে।

তখনও কি এই ঘরটাকে আলাদা একটা জগৎ বলে মনে হবে, নাকি গোটা বাড়িটাই হয়ে যাবে তখন আলাদা জগৎ?

তা সদরে খিল তুলে দিলে আলাদা জগৎ হতে অসুবিধে কি! সদরে খিল তুলে দিলে ঝি-চাকর ছাঁটাই করে দিলে।

এবং হেমন্তকে আসতে মানা করে দিলে।

আলাদা সেই জগতের সম্রাট ও। আর প্রীতি? তখন তো তার অন্য-কোন পরিচয়ই থাকবে না—অগত্যা সম্রাজ্ঞী। সেই জগতের সম্রাটের

সম্রাজ্ঞী! নিজেকে সম্রাজ্ঞী ভাবলে হাসি পাবে না? নায়িকার সাজে সেজেই নায়িকা হয়ে বসল?

প্রীতি মুখ টিপে হাসে। হাসিটা কাজে লাগল না দেখে গলা খাঁকাড়ি দেয়। হেলে দুলে খাটের দিকে এগোয়: সে যে এমন সেজেগুজে এল একবারও তো কিছু বলল না? কেউ যদি না দেখে, দেখে তারিফ না করে—কী

দাম তবে সাজার? ও-ই না বলে সব কিছুর অস্তিত্ব নির্ভর করে মানুষের দেখার ওপর, জানার ওপর? মেয়েরা বাইরে বেরোবার সময় সাজগোজ করে কেন? পাঁচজনে দেখবে বলেই না? বোরখা-পরা মেয়ের মুখে পাউডার মাখা নিয়ে ওই না একদিন ঠাট্টা করেছিল?

অনাদি এখন তার বউকে দেখছে না, কিছুই জানছে না—অতএব অনাদির কাছে অনাদির বউ যেমন ল্যাদাভ্যারাস ছিল তেমনি রয়ে গেল। অনাদি এখন তার বউকে দেখলে যেমন ভড়কে যেত তেমনি দেখছে না বলে জ্যোৎস্নার বাপের বাড়িতে দিব্যি বড়কর্তাগিরি ফলাতে পারছে। কিন্তু এই কবিটা—

'এই!' অবনীর মুখখানা প্রীতি ঘুরিয়ে নিতে চায়। 'একবার তাকাওই না বাপু।' গলায় সোহাগ ঢেলে দেয়।

'আঃ! ছাড়ো!'

'আজ আমার ওপর রাগ করে থাকবে? এমন একটা শুভ দিনে—'

'তোমার দুঃখ কোথায় সে কি আমি বুঝিনে।' তিক্ত স্বরে অবনী বলে, 'আমার জন্যেই বিয়েতে যেতে পারলে না, আমার জন্যেই দিদির বাড়িতে বিয়ে হচ্ছে, আমারই জন্যে এতবড় একটা আমোদের ব্যাপার থেকে বঞ্চিত হলে!'

'এই না হলে কবির বুদ্ধি!' প্রীতি ঝুঁকে পড়ে, দুহাতে অবনীর মাথাটা ধরে জোর করে ওকে পাশ ফেরাতে চায়।

'হয়েছে! হয়েছে! তোমাদের সবাইকে আমি চিনে গেছি। সরো, সরে যাও—'

'কক্ষনো সরব না। দেখি কার গায়ে কত জোর।'

'ভালো হচ্ছে না কিন্তু!'

'তবে খারাপই না হয় হোক।'

'আমার রাগ তো জানো না। আমি রাগি না রাগি না, রেগে গেলে একেবারে—'

'কী করবে? মারবে? বেশ, মারো। তাহলেও বুঝব পুরুষ মানুষ।'

'ফের!' অবনী প্রীতিকে ধাক্কা মারে।

প্রীতিও নাছোড় : হেরে যাবে? এত সহজেই সে হেরে যাবে? হেরে যাবে আধখানা একটা মানুষের কাছে? বুড়ো খোকাটার কাছে? যাত্রার দলের রাজপুত্তুরের কাছে?

ধাক্কাধাক্কিতে কপালে চুরের খোঁচা লেগে যায়।

'উঃ মাগো!' যন্ত্রণায় অবনী কঁকিয়ে ওঠে।

সঙ্গে সঙ্গে 'আহা লাগল? ষাট ষাট!' বলে কপালটা তার বুকের সঙ্গে চেপে ধরে প্রীতি।

এবং টাল সামলাতে পারে না।

নিয়তি! নিয়তির পুতুল। মানুষ মাত্রেই নিয়তির পুতুল। নিয়তিই মানুষকে যেখানে ইচ্ছে নিয়ে চলে, তাকে দিয়ে যা-খুশি করায়।

জীবনে যদি স্বস্তি চাও, শান্তি চাও, মানসিক যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি চাও—নিয়তির হাতে নিজেকে সঁপে দাও।

যে-জীবনে শান্তি নেই, স্বস্তি নেই, মানসিক যন্ত্রণার অন্ত নেই—কী লাভ সেই জীবনের জের টেনে? কোন্ মোক্ষ?

শীলাদি, তোমার কথা শুনে আমি যে-ভুল করেছি, তোমার জীবন দেখে সেই ভুল শোধরাব।

রাম কালোয়ারের সঙ্গে কারবারের শুরুটা ভালো হয়েছে বলে অনাদি খুশী। এমনই খুশী যে অনিমেষের বাড়ি-ছেড়ে-যাওয়ার আপসোসটা উবে গেছে।

এখন বরং অনাদির মনে হয় এ একরকম ভালোই হয়েছে: ডাক্তারি করে ছোটকা আর কটাকা রোজগার করত। তাও যদি বিলিতি ডিগ্রি থাকত। অথচ লোহার কারবারে কাঁচা পয়সা। চাঁদু হাজরা কি ছিল কী হয়েছে!

কে বলতে পারে বছর না পুরতেই অনাদি লাল হয়ে যাবে না? ছোটকা থাকলে, যা একখানা বউ জুটেছে, তার টাকায় ভাগ বসাত। প্রীতির গয়না-বেচা পুঁজি এবং অনাদির মাথা আর মেহনত দিয়ে এই কারবার—এই কারবারের মুনাফার একটি পাইও ছোটকার প্রাপ্য নয়।

ভগবান দিন দিলে অনাদি রাজার হালে থাকবে, বউকে রাণীর হালে রাখবে, মেয়েদের মেমসাহেব রেখে পড়াবে। কিন্তু ছোটকা এখানে থাকলে তাকেও রাজার হালে, তার বউকেও রাণীর হালে, তার ছেলেমেয়েদের জন্যেও মেমসাহেব রাখতে হত। কোন্ দুঃখে! যে ভাই অমন নিমকহারামি করতে পারে তার সঙ্গে কিসের সম্পর্ক?

বলতে অনাদি উত্তেজিত হয়ে ওঠে, 'কটা রঙ দেখে আজ ধরাকে সরা জ্ঞান করছিস, কিন্তু ওই ছেনাল মাগীই যদি না তোকে—' ভাই-বউকে জড়িয়ে ভাইয়ের নামে কাঁচা খিস্তি করে।

অনাদির-খিস্তি-শুনে-তাজ্জব প্রীতি ভাবে এই মানুষই কি সেদিন ছোট ভাইয়ের সঙ্গে অমন স্নেহময় দাদার মত কথা কইছিল, নানান উপদেশ দিচ্ছিল? ভাই-বউ প্রণাম করলে মাথায় হাত রেখে গদগদ গলায় 'সুখী হও মা, চিরায়ুষ্মতী হও!' বলেছিল?

আমার স্বামী কী উদার! প্রীতির সেদিন মনে হয়েছিল: ভাই পর করে দিলেও ভাইকে ও পর করে নি। পরের মেয়ে জ্যোৎস্নার অপরাধও ক্ষমা করেছে।

স্বামীকে উদার ভাবার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে বড় অপরাধী মনে হয়েছিল: এর সঙ্গে সে প্রতারণা করেছে!

অনাদির খিস্তি শুনে প্রীতি এখন বুকে বল পায়: কাল যদি অনিমেষ আসে অবিকল আগের মতই তার সাথে গলাগলি করবে, জ্যোৎস্নাকে 'মা' 'মা' বলে সারা হয়ে যাবে। প্রতারণা? কী আসে যায়? অনিমেষ জ্যোৎস্না যখন জানতে পারছে না তার অস্তিত্ব কোথায়!

'প্রীতি, এতদিন আমি নিজেকে সংযত করেছি। এ অন্যায়, এ অবৈধ—'

অন্যায়? অবৈধ? কার কাছে? যদি লোকে জানে।

'কিন্তু নিজে থেকে তুমি যখন ধরা দিলে, আমার ভুল ভাঙল। মানুষের চেয়ে তার সংস্কার বড় নয়।'

সংস্কার? অনাদির কাছে নিজেকে অপরাধী মনে করাটা যেমন সংস্কার? অনাদির সঙ্গে প্রতারণা করছে বলে অপরাধী মনে করা?

কিন্তু অনাদির সঙ্গে প্রতারণা তো প্রথম থেকেই করছে। এতদিন মন দিয়ে করেছে, আজ করছে দেহ দিয়ে—এই যা তফাত। কিন্তু কই, এতদিন তো কখনও নিজেকে অপরাধী মনে হয় নি ?

প্রতারণা! তার অস্তিত্বও লোকের জানা না-জানার ওপরেই নির্ভর করে।

সংস্কার! তুমি প্রশ্রয় দিলে আছে, নইলে নেই।

মন। মনই আসল। মনকে বাগে আনো, পোষ মানাও। দরকার হলে মনকে দুভাগে ভাগ করে ফেল—দেখবে জীবন সহজ-সুন্দর স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। সুখশান্তিতে থই থই করছে।

এ-ঘর থেকে ও-ঘর।

হেমন্তর মতই চেঞ্জে যায় প্রীতি। কিন্তু হেমন্তর মত সেটা জোর-গলায় বলতে পারে না। হেমন্ত আজকাল ওকে নিয়ে ঠাট্টা করলে আগের মত সায় দিতে পারে না: তার কাছে এ-ঘর যেমন সত্যি ও-ঘর তেমনি মিথ্যে নয়। অনিমেষ এবং অনাদির মত দুটোর অস্তিত্বই বাস্তব।

ওই ঘর আর ও জীবনে তার স্থিতি এনে দিয়েছে। তার মনের সমস্ত যন্ত্রণা ঘুচিয়ে দিয়েছে। আজ আর কারো বিরুদ্ধে প্রীতির কোন নালিশ নেই। শীলাদির বিরুদ্ধেও না।

শীলাদি! শীলাদিই যত নষ্টের গোড়া। প্রীতির কচি মনটাকে নিয়ে সে ছিনিমিনি খেলেছে। প্রীতির সামনে নিজেকে আদর্শ করে তুলে ধরেছে। আর শেষ পর্যন্ত সেই আদর্শের খোলস ছুঁড়ে ফেলে, প্রীতিকে পথে বসিয়ে, নিতান্ত সাধারণ একটা মেয়ে হয়ে গেছে।

অত কথা বলত শীলাদি কিন্তু কেন বলেনি—মনের মুখ চেয়ে কখনও চলিসনে প্রীতি, মনকে সব সময় নিজের মুঠোয় রাখবি? কেন বলেনি—জীবনে যেখান থেকে যতটুকু পাস আদায় করে নিবি?

শীলাদির জন্যেই জীবনের এতগুলি বছর বৃথা কাটল, তবু শীলাদির ওপর আজ কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই প্রীতির: শীলাদির জন্যে আর পাঁচটি মেয়ের মত হতে

পারেনি বলেই না আজ সে নতুন জীবনের স্বাদ পেল। নইলে সে-ও তো নতুন মায়ের মত মামুলী জীবন কাটাত। সমবয়সী আর-পাঁচটা বউয়ের মত তার জীবনও "থোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-থোড়ের জীবন হয়ে যেত।

আটাশ বছরে প্রীতি যেন নতুন করে সংসার পাতে।

যে-মেয়ে তিনটিকে এতদিন আপদ বলে মনে করত, এখন তাদের যখন-তখন আদর করে। ওদের আজ বড় ভালো লাগে। ভালো লাগে অনাদিকেও। ভালো লাগে সব কিছু। একজনকে ভালোবেসেছে বলেই এই ভালো-লাগা। ভালোবাসতে চাইলে সব কিছুকে ভালোবাসা যায়। আলো, হাওয়া, ফুল, গাছ, পাতা, নদী, বন, ক্ষেত, পাখি—কী নয়। মনটা যে সবসময় শিরশির করে সে ওই ভালোবাসার নেশায়।

অনাদি এক বছরের মধ্যেই সুদেআসলে গয়নাগুলি ফিরিয়ে দেবে বলেছিল, দু বছরের মাথায় ফিরিয়ে দেওয়া দূরে থাক রাম কালোয়ারকে পুলিশে ধরে নিয়ে যেতে মাথায় হাত দিয়ে বসে।

স্বামীর কাঁধে হাত রাখে প্রীতি।

'কেন তুমি ভেঙে পড়ছ। আমি যখন আছি—'

'তুমি কী করবে!'

অনাদির ঝাঁঝালো স্বরেও হাসে প্রীতি। 'দেখ কি করি।' বলে ট্রাঙ্ক খুলে সাতনরী হার সমেত কয়েকখানা গয়না এনে স্বামীর হাতে তুলে দেয়।

ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে অনাদি।

'এগুলো তো পড়েই ছিল। ফের তুমি শুরু কর। এবার একা। ওকি, কী দেখছ অমন করে?'

'তুমি—তুমি—আমার জন্যে তুমি—'

'আমার জন্যে নাকি। রানুদের ভবিষ্যৎ ভাবতে হবে না?' এদিক ওদিক তাকিয়ে প্রীতি গলার স্বর নামায়, মুখে লজ্জার আভা ফোটায়, 'তার পর যিনি আসছেন—'

'অ্যাঁ!' অনাদি যেন গালে থাপ্পড় খেয়ে ছিটকে পড়ে, 'তুমি ঠিক—'

'কবার বলব! অসভ্য!'

অনাদি চুপসে যায়।

এখনও হাতের মুঠোয় গয়নাগুলি রয়েছে বলে? তাই। নইলে প্রথম দিন শুনে তো উড়িয়েই দিয়েছিল: হতেই পারে না। তুমি ভুল বুঝেছ। অমন অনিয়ম হয়। সব মেয়েরই হয়। এতদিন হয়নি কোনদিন হবে না এমন কিছু কথা আছে নাকি। আমার মত আটঘাট বেঁধে কাজ, ফাঁসলেই হল।

'ভগবান যখন ডোবায়!' এখন অনাদি শুধু ভোস করে একটা শ্বাস ছাড়ে। 'যাক, সময় মত বলে ভালো করেছ—'

'তার মানে! তুমি আমায় খুন করতে চাও?'

'আরে না না। আমি কি তারিণীর মত গাড়োল পয়সা বাঁচাবার জন্যে বড়ি খাওয়াব। ঢাকের দায়ে মনসা বিকোব সে পাত্র আমি নই। আমি ভালো ডাক্তার দিয়ে—'

আসুক, যত ভালো ডাক্তারই আসুক, সে এসে প্রীতিকে খুন করবে: প্রীতির মধ্যে নতুন যে প্রাণের স্পন্দন জেগেছে সেটাকে বন্ধ করে দেওয়া কি প্রীতিকেই খুন করা নয়?

তারিণীর বউ মরে বেঁচেছে, প্রীতিকে থাকতে হবে জীবন্মৃত হয়ে: তারপরেও ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে? পুরনো জীবনে ফিরেও আর যেতে পারবে না।

সে কী ভয়ঙ্কর অবস্থা!

'খবর্দার! ওসব মতলব ছাড়ো।'

প্রীতি চমকায়: নিজের গলার স্বরেই চমকে উঠল, না সত্যর ডাকে?

প্রীতি চোখ মেলে তাকায়: অনাদি অনিমেষ হেমন্ত ভবতোষ জ্যোৎস্না মীরা রানু মিনু টুনু। সত্য তার ওপর ঝুঁকে পড়েছে। অনিমেষ নাড়ি দেখে হাত ছেড়ে দেয়।

'নাঃ, ভয়ের কিছু নেই। শকে অমন হয়েছে।'

অনাদি বলে, 'আমি কবার ডেকে সাড়া পেলাম না, দারোগাকে গিয়ে

বললাম, তো সে ব্যাটা বিশ্বাসই করে না। মিসেস চ্যাটার্জির স্টেটমেণ্ট ছাড়া নাকি ওর চলবে না। হেমন্ত না এলে এতক্ষণ হুজ্জোত করত।'

ভবতোষ বলে, 'জার্নালিস্টদের যে ওরা এত সমীহ করে জানতাম না। আপনার সঙ্গে চেনা ছিল নাকি হেমন্তবাবু ?'

হেমন্ত ঘাড় নাড়ে।

'পরিচয় পেয়েই এই !'

'উঃ ! আমায় এতক্ষণ জেরায় জেরায় জেরবার করেছে! হেমন্ত, তুমি যদি আরেকটু আগে আসতে ভাই !'

হেমন্ত কোন জবাব দেয় না, প্রীতি লক্ষ্য করে, একদৃষ্টে সে তারই দিকে চেয়ে আছে। পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে। অনাদিকে আড়াল করে তার সামনে এসে দাঁড়াল।

ভবতোষ বলে, 'তাহলে এবার রওনা হওয়া যাক। বেলা তো প্রায়—'

হাত ঘড়ি দেখে অনিমেষ বলে, 'হ্যাঁ। আর দেরি করা ঠিক নয়। করোনারে আবার কতক্ষণ লাগে কে জানে। চেনাশোনা আছে অবিশ্যি, তাহলেও—তুমিও আসছ তো হেমন্তদা ?'

অনিমেষের দিকে না ফিরে প্রীতির চোখে চোখ রেখে আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে হেমন্ত। দুই চোখ তার ছলছল করছে, জলে ভরে উঠেছে।

জল তো ? প্রীতি ভুল দেখছে না তো ?

কাঁদছে ? একটি মানুষ অন্তত ওর শোকে চোখের জল ফেলছে ? প্রীতি উঠে বসে। ইলেকট্রিকের শক খেয়ে যেন উঠে বসে।

উঠে বসে অবশ্য হেমন্তর কান্না দেখতে নয়, হরিধ্বনির হঠাৎ আওয়াজে।

বলহরি হরিবোল! সমস্ত বাড়িটা গম গম করে ওঠে। বলহরি হরিবোল! সারা সকালের স্তব্ধতাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিয়ে মৃত্যুর প্রচণ্ডতম সত্যটা গলা চিরে জানিয়ে দিয়ে যায়। বলহরি হরিবোল! চমকে ওঠে ঘরের লোকগুলি। ছটফটিয়ে ওঠে। এ ওর দিকে তাকায়।

প্রীতির মনে হয় এই হরিধ্বনিকে চাপা দিয়ে সে যদি চিৎকার করে না উঠতে পারে তো দম ফেটে মরে যাবে।

প্রাণপণে চিৎকার করেই উঠছিল প্রীতি, সত্য এসে তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

ডুকরে কেঁদে ওঠে রান্নু। রান্নু, মিন্নু, টুন্নু।

দরজার কাছে গিয়ে দুহাতে দরজার পাট ধরে দাঁড়ায় জ্যোৎস্না। দরজায় কপাল রাখে। কাঁদছে? জ্যোৎস্না কাঁদছে?

শাড়ির অাঁচল মুখে পুরে বেরিয়ে যায় মীরা। কাঁদছে? মীরা কাঁদছে?

সত্যকে বুকে চেপে ধরে হেমন্তর দিকে তাকায় প্রীতি: একেই বলে বন্ধু! সত্যিকারের বন্ধু! ওই এসে ওর জন্যে শোকটা সকলের মধ্যে জাগিয়ে দিল। সকলকে কাঁদিয়ে প্রীতিকে কান্নার সুযোগ দিল।

'তাহলে হেমন্তবাবু বরং তিনটে নাগাদ সত্যকে নিয়ে শ্মশানে যাবেন। চলুন অনাদিবাবু।'

ভবতোষের কথায় ফিরে দাঁড়িয়েছিল অনাদি। বলহরি হরিবোল! সঙ্গে সঙ্গে সে আর্তনাদ করে ওঠে, 'ওরে মেজকারে— !'

'দাদা!'

টেবিলে হুমড়ি খেয়ে পড়ে অনাদি। ফুলে ফুলে কাঁদে।

'দাদা! তুমিও যদি— ।' ফুঁপিয়ে ওঠে অনিমেষ।

দু ভাই দু ভাইকে জড়িয়ে ধরেছে। কাঁদছে! অনাদি কাঁদছে, তাকে থামাতে গিয়ে অনিমেষ ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল।

'কী মুশকিল!' বেকুবের মত এদিক-ওদিক তাকায় ভবতোষ।

প্রীতি জানে এবার ভবতোষও কাঁদবে। ওই তো, ওর চোখের কোণ চিকচিক করে উঠেছে। শব্দ করে না কাঁদুক দু-ফোঁটা জল পড়বে অন্তত। একজনের কান্না দেখে আরেকজন না কেঁদে পারে?

কিন্তু প্রীতি কেন কাঁদতে পারছে না? সকাল থেকে যে কান্নার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ছিল, এখন কেন তার চোখে জলের ছিটেফোঁটাও আসছে না?

সত্যকে জড়িয়ে ধরেও না?

কী বলে কাঁদবে বলে? কার জন্যে কাঁদবে বলে? ওদের কেউ

কাঁদছে ভাইয়ের শোকে, কেউ বন্ধুর শোকে, কেউ কাকার শোকে, কেউ ভাসুরের শোকে।

কিন্তু প্রীতি? প্রীতি কাঁদবে কী বলে? কার জন্যে?

ঘন ঘন হরিধ্বনি আর সমবেত কান্নার কোলাহলে কানে প্রীতির তালা লাগে। সত্যকে বুকে আঁকড়ে ধরে প্রীতি: কাঁদবে না, কাঁদবে না, কিছুতেই সে কাঁদবে না। ওরা কাঁদুক, সবাই কাঁদুক, পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ কেঁদে সারা হোক—কিন্তু প্রীতি কি তাদের সঙ্গে গলা মেলাতে পারে! প্রীতি কি ওদের একজন হতে পারে?

পরের কান্না দেখে প্রীতির কাঁদা সাজে? প্রীতির কান্না অতই শস্তা!

জীবনভর যাকে কাঁদতে হবে, কাঁদার জন্যেই বেঁচে থাকতে হবে, আজ সে পরের কান্না দেখে কাঁদার সাধ মেটাক।

সন্ধ্যা

হেমন্ত মালগাড়ির শান্টিং দেখছিল।

দেখছিল কি আর সাধ করে, দেখতে বাধ্য হচ্ছিল : বেশ-কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ওরা আসছে কিনা এগিয়ে গিয়ে দেখার জন্যে রাস্তা পেরোতে যাবে, শুরু হয়ে যায় শান্টিং। তাকে রাস্তা না-পেরোতে দেবার জন্যে ওয়াগন-গুলো যেন উঠে-পড়ে লাগে। একবার বাঁ দিকে, ডান দিকে একবার—নিজেদের মধ্যে হুড়োহুড়ি শুরু করে দেয়। প্রত্যেকেই চায় সামনের রাস্তাটুকু আগলে দাঁড়াতে। হেমন্তর সামনের রাস্তাটুকু।

নাটের গুরু অবশ্য ইঞ্জিন, হেমন্ত জানে, কিন্তু সেটা কিনা বাঁকের আড়ালে—চোখে পড়ে না।

সুতরাং ওয়াগনদের বেয়াদপিতে গা কিস-কিস করলেও চটে লাভ নেই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অগত্যা ওদের কাণ্ডকারখানাই দ্যাখ।

'এগুলো কাদের নাম হেমন্তকা ?'

মালগাড়ির শান্টিং দেখতে দেখতে হেমন্ত ভাবছিল উপমা হিসেবে জীবনের সঙ্গে কী ভাবে একে জোতা যায়, সত্যর ডাকে ফিরে তাকায়।

'ফের তুই ওখানে গেছিস ! আয়, শিগগীর চলে আয়।' বলতে বলতে নিজেই হেমন্ত এগিয়ে যায়। 'এখন ভেতরে ঢুকতে নেই—বললাম না।' হাত বাড়ায়।

'ভেতরে তো ঢুকিনি।' হেমন্তর হাত ধরে সত্য বলে, 'দরজার কাছে গিয়েছিলুম। ওই নামগুলো কাদের বললে না ?'

'মানুষের।'

'কোন্ মানুষের ?'

'যেসব মানুষ মরে গেছে।'

'এখানে এত মানুষ মরে গেছে ?'

হেমন্ত জবাব না দিয়ে দেওয়ালের দিকে চেয়ে থাকে। দুপাশের দুই দেওয়াল, এমন-কি ছাদ পর্যন্ত কাঠকয়লার আঁকিবুকি—নামের ছড়াছড়ি। অতিআধুনিক পার্থপ্রতিম থেকে সেকেলে জনার্দন, শমিতা বসুরায়ের ফুটখানেক উত্তর-পুবে নগেন্দ্রবালা দাসী।

শুধু নাম নয়, কারো কারো সঙ্গে ধামও আছে। সংক্ষিপ্ত বংশ পরিচয়ও।

কল্যাণ মিত্তিরকে খবরটা দিতে হবে: ভদ্রলোককে মাসে ডজন খানেক গল্প লিখতে হয়। নাম নিয়ে বড্ড মুশকিলে পড়ে। সময়মত যুৎসই নাম না মনে পড়লে বজায় থাকে লেখার ফ্লো? হাতের কাছে স্কুল ফাইনালের গেজেট একখানা অবশ্য সব সময় সে মজুত রাখে কিন্তু পাবে কোথায় এক জায়গায় এমন হরেক রকমের নাম? হরেক রকমের পেশার লোকের নাম? বয়সের লোকের নাম? কয়েক পুরুষের নাম?

'অ হেমন্তকা!' হেমন্তর হাত ধরে সত্য ঝাঁকুনি দেয়, 'এখানে এত মানুষ মরে গেছে?'

'এখানে কি মানুষ মরে, মরলে এখানে এনে পোড়ায়।'

'এখানে পোড়ালে বুঝি নাম লিখে রাখতে হয়?'

হেমন্ত জানে না। বস্তুত এর আগে জীবনে মড়া নিয়ে সে একবার মাত্র শ্মশানে এসেছে। মা-র মড়া নিয়ে।

কিন্তু মার নাম লিখে রাখবে কি, শ্মশানবাবু মা-র নাম জিজ্ঞেস করতে প্রথমে জবাবই দিতে পারেনি। মার নাম মনে পড়েনি বলে নয়, মার মৃত্যুটাকে তখনও সত্যি বলে ভাবতে পারছিল না বলে।

মার মৃত্যুটা তখনও তাকে বেকুব করে রেখেছিল বলে: মরেই যদি যাবে তবে কেন চিকিৎসার জন্যে অত খরচপত্র করাল?

মা-র জন্যেই না অক্ষয় চাটুয্যের কাছে হাত পাততে হল? অক্ষয় চাটুয্যের শর্তে রাজী হতে হল?

'হেমন্তকা!'

শ্মশানে মরা মানুষের নাম লিখে রাখতে হয় কিনা না জানলেও হেমন্তর মনে হয় নাম লিখে রাখার অলিখিত রেওয়াজ একটা বোধ হয় আছে: পুড়িয়ে ছাই করে অস্তিত্ব যার পঞ্চভূতে মিশিয়ে দিয়ে গেলে তার নামটা অন্তত লিখে রেখে যাও। একদিন যে সে এই পৃথিবীতে ছিল শ্মশানের দেওয়ালে তার চিহ্নটুকু রেখে যাও।

হেমন্তর মত অতীতের শবকে পরম সত্যর মত বুকের মধ্যে আগলে রাখার সাধ্য তো সবার নেই। মৃত্যুরে কে মনে রাখে, হেমন্ত ছাড়া, মৃত্যু যায় মুছে।—কবির মোক্ষম কথা।

হেমন্ত সবজান্তার মত মাথা নাড়ে।

'মেজকাকুর নাম লিখে রাখতে হবে?'

'নিশ্চয়।'

'কে লিখবে?'

'তুই-ই লিখিস।' সর্বস্ব দানের ঢঙে হেমন্ত জবাব দেয়।

'আমি?' সত্য ঘাবড়ে যায়। 'কিন্তু' আমতা আমতা করে, 'আমার হাতের লেখা যে বিচ্ছিরি!'

'ওতেই হবে।'

'কিন্তু,' সংশয় তবু যায় না সত্যর, 'আমি কী করে লিখব? নিচে যে একটুকুনও জায়গা নেই।'

'নিচের নামগুলো মুছে ফেলিস।'

'মুছে ফেলব? হ্যাঁ, হেমন্তকা, মুছে ফেলব? দোষ হবে না?'

'তাহলে আমি বরং তোকে কাঁধে করে তুলে ধরবখন।'

'না। তার চেয়ে তুমি লেখ—হ্যাঁ?'

'আমি!' এবার ঘাবড়ানোর পালা হেমন্তর: সে লিখতে যাবে কোন্ দুঃখে? কিসের অধিকারে? অবনী মরে তাকে মুক্তি দিয়ে গেছে, তার সাথে আর কিসের সম্পর্ক? নাম লিখে স্মৃতিটা তার জিইয়ে রাখার গরজ?

অবনী বলে যে একটা মানুষ পৃথিবীতে ছিল, হেমন্ত যার বন্ধু সেজে ছিল—আজ থেকে প্রাণপণে সেটা ভোলাই কি হেমন্তর সাধনা নয়?

'হেমন্তকা?'

'ওই ছ্যাখ মড়া আসছে। সরে আয়।'

মড়াটা হেমন্তকে জবাব দেওয়ার হাত থেকে উদ্ধার করে। সত্যকে টেনে নিয়ে তাড়াতাড়ি সে রাস্তার কিনারা ঘেঁষে দাঁড়ায়।

হেমন্তর সঙ্গে নছল্লা শুরু করলেও মড়া দেখেই ওয়াগনগুলো পড়ি-মড়ি করে দৌড় লাগায়। রাস্তা ফাঁকা হয়ে যায়। খাটিয়া-ঘাড়ে শববাহীরা বীরবিক্রমে ড্যাঙডেঙিয়ে রাস্তা পেরিয়ে আসে। গলা চিরে হরিধ্বনি দেয়ঃ যে-দমটাকে এতক্ষণ রিজার্ভ রেখেছিল দরকার তার ফুরিয়ে এসেছে বুঝে বেপরোয়া খরচ করতে থাকে।

'হেমন্তকা?' শক্ত করে হেমন্তর হাত মুঠো করে সত্য গা ঘেঁষে দাঁড়ায়।

'বল!'

'হিন্দু মরলে পোড়ায় আর মুসলমান মরলে কবর দেয়, না—?'

'খৃশ্চানদেরও কবর দেয়।'

'কবর দেওয়াই ভালো, পোড়ানোটা বিচ্ছিরি—না হেমন্তকা? তবে কেন পোড়ায়?'

'কবর দেয় না বলে।'

'কেন কবর দেয় না?'

'নিয়ম নেই বলে।' পাছে সত্য ফের সওয়াল করে 'কেন নিয়ম নেই?' হেমন্ত আগেভাগেই বলে রাখে, 'কবর দেওয়ার নিয়ম নেই, আবার না যদি পোড়ায় লাস নিয়ে কী করবে? তাই পুড়িয়ে ফেলে ঝঞ্ঝাট চুকোয়।'

'অ্যাঁ?'

ছেলেমানুষ! সত্যর কাঁধে হেমন্ত হাত রাখেঃ এসব বাস্তব সমস্যার কথা ও বুঝবে না। বুঝিয়ে বললেও না।

অমন যে বুদ্ধিমতী ওর মা সেই যখন না বুঝে অমন ছেলেমানুষি করে ফেলল। তীরে এনে তরী ডোবাল!

তীরে এনে তরী ডোবানো ছাড়া কি? ঘরে সবাই যখন কান্নার কোরাস ধরেছিল, প্রীতি কাঁদেনি। হেমন্ত ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময়েও প্রীতির চোখে জল দেখেনি। দোতলা থেকে লাসের পিছু পিছু সবাই এসেছিল, কান্নার দমক যথারীতি চড়াতে চড়াতে—প্রীতি ঘরের বার হয়নি। সদরের সামনে লাস নামিয়ে রেখে কোমরে গামছা-বাঁধা, বিড়ি-সিগ্রেট-খাওয়া, পারম্পরিক-ডিরেকশন-দেওয়া ইত্যাদির জন্যে যখন মিনিট

পনেরর ইণ্টারভ্যাল হয়, বারবার দোতলার বারান্দায় তাকিয়েছে হেমন্ত—প্রীতির পাত্তা মেলেনি।

সাবাস! মনে মনে হেমন্ত তখন প্রীতিলতার পিঠ চাপড়েছে।

এবং আত্মগ্লানিকে জাগিয়ে তুলেছে: নগণ্য একটা মেয়েমানুষের কাছে হেরে গেল! কৃতজ্ঞতার শেষ কিস্তি শুধতে ওরই সামনে সে চোখ ছলছলিয়েছিল!

অবনীটা আহাম্মক ছিল—তার হাসিতে হেসেছে কান্নায় কেঁদেছে—কিন্তু প্রীতি কেন তার হাসি-কান্নার তোয়াক্কা রাখবে!

বলহরি হরিবোল!

হেমন্তও এবার সবার সঙ্গে গলা মেলায়। প্রীতির সামনে চোখ ছলছলানোর প্রায়শ্চিত্ত করতে মরিয়া হয়ে যায়। মিছিলের মুখপাত্রের অনুকরণে নিজেই বারকয়েক 'ইন্‌কিলাবে'র মত করে 'বলহরি' হেঁকে ওঠে। জবাবে অবিকল 'জিন্দাবাদ-এর' ভঙ্গিতে সমস্বরে সবাই 'হরিবোল' দিল। হবু নেতার মত হঠাৎ একঝলক আত্মবিশ্বাস বুকে তার ঘাই দিয়েও ওঠে। খাটিয়া তোলায় সাহায্য করার জন্যে তড়বড়িয়ে তখন এগিয়ে যায়।

আর ঠিক সেই সময় আচমকা সিনেমার নায়িকা বনে গিয়ে আলু-থালু বেশে ছুটে আসে প্রীতি, হুবহু সিনেমার নায়িকার মতই কোথাও হোঁচট না খেয়ে ক্যামেরা-লাইট-দিয়ে-মাপাজোকা মার্কামারা জায়গাটিতে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। দুহাতে লাস জড়িয়ে ধরে হিষ্টিরিয়ার রোগীর মত মাথা ঝাঁকায়, দাপাদাপি লাগায়।

সবাই হাঁ। সবে-ধরানো সিগারেটটি মুখ থেকে ভবতোষের বেমালুম খসে পড়ে। মীরা ঘন ঘন চশমার কাচ মোছে—পাছে ভালো করে দেখার আগেই বদলে যায় দৃশ্যটা? চটপট পাতা ফেলে দেখে চোখের জল ঝাড়ে জ্যোৎস্না ওই একই কারণে? পাড়ার ছেলেগুলো সরে দাঁড়ালেও কুতকুত করে কী দেখছে? সকলের নজর এখন প্রীতির দিকে বলে মওকা বুঝে দুচোখে চেখে নিচ্ছে রানুকে, মিনুকে? যার কাণ্ড দেখে নিজেদের কাপড়চোপড় সামলাতে ভুলে গেছে যে-রানু, যে-মিনু।

হেমন্তর মতই অনাদির চোখজোড়া সকলের মুখের ওপর ছটফট করছিল। নানান মুখের গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খেতে খেতে চোখা-চোখি হয়ে যায় দুজনের। সঙ্গে সঙ্গে অনাদির ছটফটানি মাত্রা ছাড়ায়।

বউকে টেনে-হিঁচড়ে তোলার জন্যে অনাদিও গিয়ে লাসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছিল, অনিমেষ খপ করে ধরে ফেলে: থাক দাদা, থাক। একটু কাঁদতে দাও। শোকের আউটবার্স্ট হওয়া দরকার। যেমন গুম হয়ে গিয়েছিল বৌদি, আমি তো ভয়ই পেয়েছিলাম।

শোকের আউটবার্স্ট! শোক!

কিসের জন্যে শোক? ভালোবাসার জন্যে!

এরই নাম প্রেমের বাঁধন। এ বড় বজ্র আঁটুনি: প্রিয়তম মরে ভূত হয়ে গেলেও লাস তার ছাড়বে না!

কিন্তু ধরো, হেমন্ত যদি এখন সবাইকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বা ভুলিয়ে-ভালিয়ে রাজী করায় যে, দরকার নেই অবনীকে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে, পুড়িয়ে—প্রীতিই তার প্রিয়তমকে বুকে করে রাখুক—রাজী হবে তো? আজ রাজী হলেও কাল? পরশু? তরশু? তার পরের দিন?

চিরদিন?

প্রিয়তমের দেহে যখন পচন ধরবে, গন্ধ ছাড়বে, পোকা বিজবিজ করবে, গলে গলে পড়বে—তখন, পচাগলাপোকাধরা দুর্গন্ধ একতাল মাংসের কাদা আর হাড়কখানি বুকে চেপে রাখার মত ভালোবাসার তাগদ তখনও থাকবে তো?

তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি শতরূপে শতবার জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার—বলে নাকি-নাকি সুরে দুহাতের চেটোতে করতাল বাজিয়ে গেয়ে উঠতে পারবে তো তখনও?

'মানুষকে কী করে পোড়ায় হেমন্তকা? শ্মশানে বুঝি মানুষ পোড়াবার উনোন আছে?'

'উনোন নয়, চিতা।'

'বাঘ?'

'দূর পাগল! মানুষ পোড়ানোর উনোনকে চিতা বলে। গর্তের ওপর কাঠ সাজিয়ে সাজিয়ে—'

কাঠগুলো থিসিস, মড়াটা এন্টিথিসিস, সিনথিসিস—ধোঁয়া, আগুন, ছাই। মানিক বাঁড়ুয্যেকে পুড়তে দেখে ডায়ালেকটিকসের জনগণবোধ্য এই মেড-ইজিটা তৈরি করেছিল হেমন্ত। দেবে নাকি সেটা সত্যকে গিলিয়ে? ডায়ালেকটিকস না বুঝে এযুগে যখন বেঁচে থাকার প্রেষ্টিজ নেই, এখন থেকেই বুঝতে শিখুক।

'চলো না দেখে আসি। আমি কক্ষনো চিতা দেখিনি। অগ্নি গঙ্গাও দেখব। জানো হেমন্তকা, আমি না কক্ষনো গঙ্গায় চান করিনি। মা আমায় কিছুতেই—'

'আজ করিস। তুই তো আজ'—মুখে আগুন দিবি বলতে গিয়ে হেমন্ত গলা খাঁকাড়ি দেয়: স্বাভাবিক নিয়মে ওরই মুখে আগুন দেওয়ার কথা। অথচ ও মুখে আগুন দেবে শুনে প্রীতি চমকে উঠেছিল। আর তার চমকানো মুখের দিকে প্যাটপ্যাট করে অনাদি চেয়ে ছিল। মনে পড়ে যায়।

'তুই কিছু খাবি?' গলা খাঁকাড়ি দিয়ে হেমন্ত জিজ্ঞেস করে, 'খিদে পেয়েছে?'

'খিদে?' থুতু গিলে সত্য বলে, 'আমার তো আজ বাইরে খেতে নেই। তোমার বুঝি পেয়েছে?'

'তা পেয়েছে! সকাল থেকে কিছু খাইনি।'

'তাহলে মীরামাসি যখন অত করে সাধাসাধি করল খেলে না কেন?'

ভুল হয়ে গেছে। অফিসে গিয়ে অনাদির টেলিফোনের কথা শোনা মাত্র ওখানে যাওয়া যেমন ভুল হয়ে গিয়েছিল: অবনীই যখন আর নেই কী প্রয়োজন ছিল ও বাড়িতে যাওয়ার? শোকের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার? এমনিতেই মানুষ মরলে হেমন্তর শোকের বদলে ঈর্ষা জাগে—একটা লোক এই পৃথিবী থেকে দিব্যি কেমন কেটে পড়ল। অবনীর মৃত্যু তো দস্তুরমত একটা সুসংবাদ।

শুধু প্রীতির কাছে চোখ ছলছলানো নয়, যতক্ষণ ওখানে ছিল মুখখানাকে

শোকাকুল করে রাখতে হয়েছে। নেহাত বয়স্ক ব্যাটাছেলে বলে কেঁদে পাড়া মাৎ করতে পারছে না ভাব দেখাতে হয়েছে। সকলের কান্নার বক্তব্যে হাসি পেলেও— মড়াকান্নার পোস্টমর্টেম করলে হাস্যকর কয়েকটি সিদ্ধান্ত ছাড়া কী মেলে! —গলা খাদে নামিয়ে যতদূর সম্ভব কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে কথা বলতে হয়েছে। একে-ওকে দফায় দফায় সান্ত্বনা বিলোতে হয়েছে।

অর্থাৎ এক-শো রজনী দূরে থাক এ নাটক হপ্তাখানেকও চলবে না জেনেও প্রাণপণে নিজের ভূমিকা পালন করে যেতে হয়েছে। ঝানু অভিনেতার মত সেই ভূমিকায় এমনই তদ্‌গত হয়ে গিয়েছিল যে মীরা খাবার জন্যে সাধাসাধি করলেও খাওয়ার কথা ভাবতে পারেনি।

অথচ অমন ডামাডোলের মধ্যেও ফলারের ব্যবস্থাটা মীরা ভালোই করেছিল। সে যে সবদিকসামলানেওয়ালী পাক্কা গিন্নি তার প্রমাণ দেবার সুযোগ পেলে মীরা কখনো ছাড়ে না, আজও ছাড়েনি।

খাবনা-খাবনা খেতে-কি আর ইচ্ছে করে! বলতে বলতেই হেমন্তর সামনে অনাদি অনিমেষ চেটেচুটে খেয়েছে। জল খেয়ে অনাদি যথারীতি ঢেঁকুরটিও তুলেছে।

ওদের রওনা করে দিয়ে অফিসের নাম করে হেমন্ত গেছে কনকের কাছে। নাটকীয় ভাবেই খবরটা কনককে দিয়েছে। কিন্তু খবর শুনে চমকে ওঠা দূরে থাক, কনক টুঁ শব্দও করেনি। কেন? এমন একটা চাঞ্চল্যকর খবর শুনেও ওর চোখেমুখে বিকার নেই কেন? এটা অফিস বলে? সবাই তাদের দুজনকে লক্ষ্য করছে বলে? কিন্তু চেপে চেপে যে দীর্ঘশ্বাসটা ছাড়ল সেটা দুঃখের না স্বস্তির? তবে কি অবনীর মৃত্যুতে কনকও তার মত 'যাক বেঁচে গেলাম!' ভাবছে?

কনক ক্যান্টিনে ডেকেছিল। কেন ডেকেছিল? প্রকারান্তরে অবনীকে খুন করে তাকে বাঁচিয়ে দেওয়ার কৃতজ্ঞতায়, না তার মুখ দেখেই কনক বুঝে গিয়েছিল যে এই বেলা বারোটা পর্যন্ত সে দু কাপ চা ছাড়া কিছু খায়নি?

ক্যান্টিনে যায়নি। খাওয়ানোর কারণ সম্পর্কে খটকা লাগলে খাওয়া

যায়? এ খাওয়া তো স্বামী স্ত্রীর চুমো খাওয়া নয় যে অভ্যাসবসে খেয়ে ফেললেই হল।

মানে কি কনকের এই দীর্ঘশ্বাসের?

হাঁটতে হাঁটতে কার্জন পার্কে গেছে। সেখানে খানিকক্ষণ বসে মেটেবুরুজের বাসে উঠে পড়েছে। মেটেবুরুজে কেউ নেই, বেড়াবার মত জায়গাও নয় মেটেবুরুজ—কিন্তু কণ্ডাকটারের সুরেলা ডাকে কেমন একটা আকর্ষণ বোধ করেছে, বাসে ওঠার পর হুঁশ হয়েছে যে বাসে উঠেছে।

কেন স্বস্তির শ্বাস ফেলল কনক?

সারাটা দুপুর বাসে বাসে ঘুরে ওই এক প্রশ্ন মনকে শুধিয়েছে। তবে কি আজ, এতদিনে কনকের সঙ্গে তার সত্যিকারের মিল হল? অবনী মরে এই মিল ঘটিয়ে দিয়ে গেল? এক সাথে দুজনকেই দুদিক দিয়ে মুক্তি দিয়ে?

প্রকারান্তরে অবনীকে খুন করায় তাহলে হেমন্তর ডবল বাহাদুরি?

কিন্তু স্বস্তির শ্বাস ফেলেই কনক পূবদিকেই পার্টিশান দেওয়া ঘরটার দিকে তাকিয়ে ছিল না? ওটাই না ওদের সুপারিণ্টেডেণ্ট সুব্রত গুপ্তের চেম্বার?

তবে কি কনক স্বস্তির শ্বাস ফেলেছে অন্য কারণে? যে কথাটা হেমন্ত একদিন রাগ করে বলেছিল, গরজ বুঝে সেটাকেই আজ তার মনের কথা বলে ধরে নিয়েছে?

সে চলে আসা মাত্র কনক কি তবে সুব্রতর চেম্বারে গিয়ে ঢুকেছে? এখনও সুব্রতর চেম্বারে? একসঙ্গে লাঞ্চ খাচ্ছে? ম্যাটিনিতে ওর সঙ্গে আজ সিনেমায় যাবে? সন্ধ্যেয় ওর মোটরে রেড রোডে হাওয়া খাবে? কিংবা গঙ্গার ধারে গিয়ে বসবে? পাশাপাশি, গা-ঘেষাঘেষি করে? তারপর একসময়—

হেমন্ত যখন নিজের দাবি কখনই জানাবে না এবং অমিয় জীবনে আর বিলেত থেকে ফিরবে না, দিদি সব জেনেও না জানার ভান করে থাকবে ও অবনী মরে গেল—কিসের পরোয়া!

যার স্বামী নির্বিকার আর বিয়ের সাক্ষীরা হয় লোপাট, নয় থেকেও নেই— সে মেয়ে কুমারী ছাড়া কি।

কুমারী মেয়ের অশেষ স্বাধীনতা। চাক্‌রে কুমারী মেয়ের।

সুতরাং কনক যদি এখন—

সম্ভব। মুক্তির আনন্দে কনকের পক্ষে সবই আজ সম্ভব।

নইলে কেন ক্যান্টিনে যাওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করল না? ক্যান্টিনে অসুবিধে থাকে বাইরে কোন রেঁস্তরায়? কনক জোর করলে সাধ্য ছিল হেমন্তর চলে আসার? কনকের না ধারণা এমনিতে হেমন্ত যাই করুক তার কথা কখনই ফেলতে পারবে না? এবং স্বামিত্ব বজায় রাখতে কনকের এই ধারণাটাকে না এখনও হেমন্ত প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে?

বাসে বাসে ঘুরতে ঘুরতেই একসময় মনে পড়ে গেছে সত্যকে শ্মশানে নিয়ে আসবে বলে কথা দিয়ে এসেছিল। কথা! হেমন্তর দেওয়া কথা! দেওয়া-কথার খেলাপ হেমন্ত করতে পারে? অন্তত অবনীর সৎকারটা না হওয়া পর্যন্ত!

'এখানে রেষ্টুরেট আছে হেমন্তকা?'

হেমন্ত ঘাড় নাড়ে।

'তুমি খাবে চলো। আমি দেখব, তুমি খাবে—অ্যাঁ?'

সেটা মন্দ হয় না। গোগ্রাসে গিলতে গিলতে কল্পনা করা: সিনেমায় সুব্রতর পাশে কনক, নামকাওয়াস্তে সামনে চেয়ে দুজনে, সুব্রতর জায়গায় নিজেকে কল্পনা করলে দৃশ্যটা আরও জ্বলজ্বলে হয়ে ওঠে।

আট বছর আগেকার নিজেকে। সেই ক্ষণে ক্ষণে রোমাঞ্চ, পিছনের দর্শকদের অস্ফুট মন্তব্য, শেষ পর্যন্ত অন্ধকারেই উঠে-পড়া, কোন রেস্তরাঁয় কেবিনে ঢুকে—

দুই চোয়াল হেমন্তর শক্ত হয়ে ওঠে: কেবিনে ঢুকে সে টানা মাত্র তার বুকে যেমন নেতিয়ে পড়ত কনক সুব্রতর বুকেও কি তেমনি করে ঢলে পড়েছে? বা পড়বে?

'জানো হেমন্তকা, আমি না কক্ষনো রেস্টুরেণ্টে খাইনি। মা বলে রেস্টুরেণ্টে খেলে অসুখ করে। কিন্তু বড়দি মেজদি সেজদি বায়স্কোপে

গেলেই রেস্টুরেণ্টে খায়। চপ কাটলেট ডেভিল—ডেভিল কাকে বলে হেমন্তকা? তুমি আজ ডেভিল খাবে? খেয়ো, অ্যাঁ? তাহলে আমার বেশ দেখা হয়ে যাবে।'

মন্দ হয় না। দাঁতে দাঁতে ঘষে হেমন্ত: সত্যকে দেখিয়ে দেখিয়ে চপ কাটলেট ডেভিল যদি খায়। তার খাওয়াটা অবিশ্যি কনক টের পাবে না, কিন্তু অবনী পাবে? অবনীর স্বর্গীয় আত্মা? স্বর্গীয়রা যে সবকিছু দেখে শোনে জানে। পেলে কী করবে? সে মরার সঙ্গে সঙ্গে কনক ওদিকে কুমারী হয়ে উঠেছে দেখে কী করবে? এবং এদিকে 'কাউকে বলব না' বলে সত্যকেও চপ-কাটলেট খাইয়ে দিলে কী করবে?

আত্মার অস্তিত্ব যাচাইয়ের মস্ত একটা মওকা মিলেছে। প্রাণের বন্ধুর আত্মার অস্তিত্বের।

সত্যর হাত পাকড়ে পা বাড়াচ্ছিল হেমন্ত, পিছিয়ে আসে।

'ওই ছাখ ওরা এসে গেছে।'

দলের শেষে শক্তিকে দেখে হেমন্ত অবাক হয়। শক্তিদের দেখে।

'তোমরা?'

'এই তো!'

'কী করে খবর পেলে?'

'হীরেনের খোঁজে আপনাদের আফিসে গিয়েছিলাম, গিয়ে শুনলাম।'

শক্তি, অমিতাভ, কুমার, তপন, চিরঞ্জীব—সকলের দিকে একবার চেয়ে নিয়ে হেমন্ত বলে, 'যাক্ তবু একটা শোকযাত্রা হল!'

'কোথায় আর হল হেমন্তদা!' কুমার আপশোস করে, 'খবর পাওয়া মাত্র আমরা ট্যাক্সি করে বরানগরে ছুটলাম, ঠিকানা খুঁজে খুঁজে বাড়ি বের করলাম—'

অমিতাভ বলে, 'কিন্তু গিয়ে শুনি অনেক আগেই ওঁরা বেরিয়ে পড়েছেন। তখন আবার করোনারের—'

তপন বলে, 'ট্যাক্সিতে ফেরার পয়সা নেই। কাজেই বাসে করে—'

চিরঞ্জীব বলে, 'করোনারেও যদি সময়মত এসে পৌছতে পারতাম! শেষ পর্যন্ত ওদের নাগাল পেলাম মিনার্ভার কাছে কাছে।'

'খবরটা যদি আগে জানতে পারতাম হেমন্তদা।' কুমারের আপশোস যায় না।

আগে মানে গতকাল? গতকাল হলে কখন? মনে মনে খতিয়ে দেখে হেমন্ত: অবনীর চোখমুখ দেখে ঘাবড়ে গিয়ে 'আজ আমি চলি' বলে সে যখন উঠে পড়ে রাত তখন প্রায় দশটা। অবনী কি তখনই তার ভবিষ্যৎ লাইন অব অ্যাকশন ঠিক করে ফেলেছিল? ঈশ, ঘুণাক্ষরেও যদি আভাস দিত হেমন্তকে।

শক্তি বলে, 'ঘণ্টা দুয়েক আগে পেলেও—'

'মিছিল বার করতে?'

'মিছিল না হোক সবাইকে খবরটা দিতে পারতাম। আমাদের সকলে তো আসতই, আরও অনেকে আসত। অবনীবাবু তো কোন দলের ছিলেন না, সেই হিসেবে—'

চিরঞ্জীব বলে, 'খবর দেওয়ার মোটামুটি একটা ব্যবস্থা অবশ্য আমরা করে এসেছি। ত্রিদিব সন্ধ্যে নাগাদ যত জনকে পারে নিয়ে আসবে। ও দিকে হীরেনও অফিস থেকে লেখকদের কাছে ফোন করেছে—যদি কেউ বাণী দেন। তারপর হীরেনও আসছে। রিপোর্টার হিসেবে।'

'হীরেন আসছে? রিপোর্টার হিসেবে?'

'আসছে কি হেমন্তদা, এসে পড়ল বলে।' শক্তি বলে, 'ফটোর খোঁজে ও গেছে বরানগর। সেখান থেকে এখানে আসবে। পরে একজন ফটোগ্রাফারও আসতে পারে। আপনাদের চীফ রিপোর্টার দেখলাম খুব ইন্টারেস্টেড।'

কুমার বলে, 'সে নিউজ এডিটারের জন্যে। নিউজ এডিটার লেখক হলে এই এক সুবিধে—লেখকরা রেকগনিশান পায়। নইলে খবরের কাগজ তো কেবল পলিটিশানদের ঢাকে কাঠি দিতেই আছে।'

'অবিশ্যি হেমন্তদাদের নিউজ এডিটারকে লেখক বানাবার জন্যে কলম পিষতে হয় অনেককে।' মুচকি মুচকি হাসে তপন। 'কি বলিসরে চিরু? ওঁর নতুন উপন্যাসটার জন্যে কত রয়ালটি পেলি?'

'আঃ! কী হচ্ছে! এ কথা যদি মনিদার কানে ওঠে আমার ফিউচার লেখা নট হয়ে যাবে।'

শক্তি বলে, 'ওর না হয় উপন্যাস, কিন্তু তুই যে গল্প—'

তপন বলে, 'ছোঃ! উপন্যাসের পাশে গল্প! কী বলে চিরু ওটা বেহাত করলি? উপন্যাস পেলে যে-কোন পাবলিশার লুফে নিত।'

চিরঞ্জীবের হয়ে জবাব দেয় কুমার, 'ও মাল নিজের নামে ছাপলে চিরুর আমরা মুখও দেখতাম না।'

'কিন্তু জোর বিক্রি হচ্ছে। দু মাসে এডিশান!'

'তবেই বোঝ!'

ওদের কথায় হেমন্ত কান দেয় না: এসব কথা শোনাও পাপ! নিউজ এডিটার তার বস। অন্নদাতা বস্ত্রদাতা। কলিযুগে ভগবান মালিক অবতার ধারণ করেছে বটে কিন্তু যুগটা কলি কিনা তাই নিজ হাতে মারে না কোন মাছি একটিও। বস-দের আম-মোক্তারনামা দিয়ে নিজেরা নামকীর্তন করে কাটায়। সাধারণের মরণবাচন বস-দের হাতে। বস্তুত বস-রাই আজ ডি-ফ্যাক্টো ভগবান।

হীরেন বরানগরে গেছে শুনে হেমন্তর দস্তুরমত দুশ্চিন্তা হয় প্রীতির জন্যে: বয়স অল্প এবং সবচেয়ে জুনিয়ার হলে কি হবে অতি-পাখোয়াজ রিপোর্টার হীরেন। কবি মানুষের আত্মহত্যা, তায় এমন নতুন কায়দায়—রোমাঞ্চক কোন রহস্য না থেকে পারে? না থাকলে জমবে রিপোর্ট?

ফটোর অজুহাতে গিয়ে জমাটি রিপোর্টের মালমশলার খোঁজে না জানি কী ভাবে সে জেরায় জেরায় নাজেহাল করছে প্রীতিকে!

শক্তি বলে, 'আমরা একটু চা খেয়ে আসি। আপনি যাবেন?'

'না, তোমরা এসো।'

শক্তিরা পিছন ফিরতে না ফিরতে অনাদি এগিয়ে আসে।

'ওরা সবাই কবি, না হেমন্ত?'

হেমন্ত সাড়া দেয়।

'দেখলেন ভবতোষবাবু, আমি ঠিক ধরেছিলাম।' ভবতোষের দিকে ফিরে অনাদি ভারিক্কি চালে মাথা নাড়ে।

ভবতোষ বলে, 'সন্দেহ আমারও হয়েছিল। কিন্তু আমি ভাবছিলাম ওরা কী করে জানল।'

'আমাদের আফিসে গিয়েছিল।'

'তাই বলুন।'

অনাদি শুধায়, 'ওরা কি চলে গেল হেমন্ত?'

হেমন্ত বলে, 'এখনই কি যাবে। বরং আরও কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক আসছে।'

'আসছে? আরও কবি আসছে? সাহিত্যিকও আসছে?'

'হুঁ।' বলে অবনীর খাটিয়ার দিকে এগোয় হেমন্ত: কী খুশী অনাদি! খুশিতে হাততালি দিয়ে ওঠার মত খুশী! সারাটা দিনের ধকল সত্ত্বেও খুশির চোটে চোখ-মুখ কেমন ঝিলমিলিয়ে উঠেছে।

'এদের সঙ্গে বুঝি মেজকার আলাপ ছিল?' অনাদি পিছন পিছন আসে। 'মানে চিঠি লেখালেখি—'

'চিঠি-লেখালেখি ছিল না তবে অবুর কবিতা ওরা পছন্দ করত। 'কবি' বলে ওদের একটা কবিতার কাগজ ছিল তাতে অবুর অনেক কবিতা ছাপা হয়েছে।' অবনীর ওল্টানো-চোখ আর চিমসানো মুখের দিকে চেয়ে হেমন্ত জবানবন্দী দেয়: কাল তোকে একটা কথা বলিনি অবু, তোর ওপর আক্রোশ জেগেছিল বলে, তোকে আঘাত দেবার জন্যে দিক-বিদিক জ্ঞান-শূন্য হয়ে গিয়েছিলাম বলেই বলিনি যে শক্তিদের কাগজে, একমাত্র শক্তিদের কাগজেই তোর কবিতা বিনা মেহনতে ছাপা হয়েছে। শক্তিরাই শুধু তোর কবিতা প্রত্যেকবার আগ্রহ করে চেয়ে নিয়েছে। আর সকলে সামনে আমাকে তোর লিটারারী এজেন্ট এবং আড়ালে টাউট বলে ঠাট্টা করলেও তোর বন্ধু বলে শক্তিরাই শুধু আমাকে খাতির করে।

'ছিল মানে? নেই এখন? হেমন্ত!'

'না।' অনাদির নাছোড়বান্দা ব্যবহারে হেমন্ত চটে। চড়া গলায় গড় গড় করে বলে যায়, 'যে দুজনের খরচে কাগজটা বেরোত তাদের একজন বাপ মরে যাওয়ায় সংসার নিয়ে এখন হাবুডুবু খাচ্ছে, আরেকজনের চাকরি যাওয়ায় পরের নামে উপন্যাস লিখছে।'

অনাদি চুপ করে থাকে।

হেমন্ত খাটিয়ার কাছ থেকে সরে এলে সে-ও মোড় ফেরে, ফের হেমন্তর পিছে পিছে আসে।

'তাহলে টাকার জন্যেই ওদের কাগজটা উঠে গেল, বলছ?'

'তাই।'

'আচ্ছা, তুমি জানো কী রকম খরচ-খর্চা লাগত?'

'কিসের?'

'ওই—ওদের কাগজ বের করতে?'

'কেন—আপনি দেবেন নাকি?' হেমন্ত ঘুরে দাঁড়ায়।

'আমি!' অনাদি ক্লিষ্ট হাসে। 'আমার টাকা কোথায় ভাই। তবে ওই হতভাগার—।' অনাদির হিক্কা ওঠে। এক ঝলক শিকনি সড়াৎ করে বেরিয়ে আসে। চোখ মুছতে গিয়ে সারা মুখ চোখের জল আর নাকের শিকনিতে মাখামাখি করে ফেলে অনাদি ফুঁপিয়ে ওঠে।

তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নেয় হেমন্ত: আচ্ছা ফ্যাসাদ তো এই লোকটাকে নিয়ে! ক্ষণে ক্ষণে ভোল বদলায়। ভাইয়ের জন্যে কেঁদে গলা চিরেছিল, আবার ভাইকে জড়িয়ে ধরে বউকে কাঁদতে দেখে খুনীর মত চোখ জোড়া ঝিকিয়ে তুলেছিল। এখন আবার ভাইয়ের শোকে ফোঁপাতে শুরু করেছে।

'ওই যে—আপনাকে বুঝি অফিসে ডাকছে অনাদিদা। এ নিয়ে পরে কথা হবে।' বলে ঝটপট পা চালায় হেমন্ত। লোকটার মুখখানা যেমন থকথকে আর গলায় স্বর যেমন গদগদে হয়ে উঠেছে, এককেবার সন্দেহ জাগে, অবনীটা মরেও মরেনি—নবকলেবর ধারণ করেছে দাদার মধ্যে।

নইলে সবকিছু জেনে-শুনেও ঘড়েল সংসারী যে-মানুষটা এতদিন আহাম্মক সেজে ছিল, এখন সে সত্যি সত্যিই আহাম্মক বনতে শুরু করেছে?

এখানে আসিলে সকলেই সমান।—চারপাশে একটা চক্কর দিয়ে, তিনটে দাউ-দাউ এবং দুটো নিভন্ত চিতার পাশে খানিকক্ষণ করে দাঁড়িয়ে থেকে, পোড়ার-অপেক্ষায়-মজুত নানান বয়সী চারটে লাসের নাড়িনক্ষত্রের খবরাখবর

নিয়ে ক্লাসিকাল এই উক্তিটার সংশোধন করে হেমন্ত: এখানে আসিলে সকলেই, মরে ছাই হবার পর, সমান।

শ্মশানের খরচ যোগাড় করে স্বামী এসে পৌঁছায়নি বলে ওপাশে একটি আধবয়সী লোক সকাল থেকে তার একমাত্র রোজগেরে জোয়ান ছেলেটার লাশ আগলে এখন পর্যন্ত বসে থাকলে কি হবে, এদিকে ওরি মধ্যে অবনীকে ঘি মাখানো শুরু হয়ে গেছে। চারপাশ থেকে সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ে তাই দেখছে।

সকলের পিছনে দাঁড়িয়ে চোখ বুজে হেমন্ত ঘন ঘন নিশ্বাস নেয়: গন্ধটা তেমন যুৎসই লাগছে না কেন? তবে কি ঘিয়ে ভেজাল আছে? নির্ভেজাল দালদা নয়ত?

অবনীর সঙ্গে সাহিত্য-আলোচনায় মশগুল হয়ে থাকলেও প্রীতি ঘরে ঢোকা মাত্র টের পাওয়া যেত। অবনী পেত তার গায়ের গন্ধ, হেমন্ত ঘিয়ের। খাঁটি গাওয়া ঘিয়ের।

অবনীর জন্যেই বাড়িতে প্রীতি দু-দুটো গোরু রেখেছিল। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সেই দুই গোরুর দুধ দোওয়াত। নিজের হাতে সর জ্বাল দিয়ে ঘি তৈরি করত। নিজের হাতে সেই ঘিয়ে অবনীকে লুচি ভেজে খাওয়াত।

হেমন্তও ভাগ পেত। হেমন্ত যে অবনীর বন্ধু। হরিহর বন্ধু!

অনাদি কি এসব জানত না? জানত। জানান্ না দিলেও সবই জানত। তবু কেন এখন দালদা মাখাতে দিচ্ছে? দালদা কিম্বা ভেজাল ঘি?

মরা ভাইয়ের নামে কাগজের জন্যে টাকা দিতে রাজী, অথচ—

পিছন থেকে সত্য হঠাৎ জড়িয়ে ধরে চমকে দেয় হেমন্তকে।

'কিরে?'

'ভয় করছে!'

'ভয় করছে?'

'ভয় করছে!'

ভয় করছে? কেন অবনীর আধখানা শরীরটা ঘিয়ে চপচপে হয়ে আরও বীভৎস হয়ে উঠেছে বলে? তা দৃশ্যটা আর সকলের কাছে নয়নসুখকর হলেও ছেলেমানুষের ভয় পাওয়া স্বাভাবিক।

হেমন্ত বলে, 'তুই এখানে এলি কেন? তোকে না ওখানে বসতে বলে এলাম।'

'বাবা যে ডাকল।'

বাবা? হেমন্ত একবার এর একবার ওর—একবার মরা মানুষটার একবার জ্যান্ত মানুষের—দিকে তাকায়। মরা মানুষের পক্ষে ডাকা অসম্ভব। সুতরাং মাটির সরা থেকে খাবলা খাবলা ঘি নিয়ে মড়াটাকে যে মাখাচ্ছে ডেকেছে সেই। সুতরাংয়ের যুক্তিতে সেই বাবা।

'তবে দাঁড়া।' সত্যকে সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দেয় হেমন্ত।

ভবতোষ বলে, 'হয়েছে অনাদিবাবু হয়েছে—আর লাগবে না। এতর দরকার ছিল না। উঠুন এবার।'

ঘি-মাখা হাত দুপাশে ছড়িয়ে অনাদি টান্ টান্ হয়ে দাঁড়ায়। ফ্রী স্টাইলে প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করার পর বিজয়ী পালোয়ানের মত লাশের দিকে তাকায়।

'চন্দনকাঠ? চন্দনকাঠ কোথায় গেল?'

'ওই তো!'

'এইটুকু!' অনাদি খুঁৎ খুঁৎ করে।

'কয়েক ফোঁটা ঘি আর কয়েক টুকরো চন্দন হলেই চলে। এ নিয়মরক্ষা বই তো নয়।' ভবতোষ বলে, 'তবু তো আপনি— সত্য, তুমি বাবা এদিকে এসো। পুরুত মশায়? পুরুত মশায় গেলেন কোথায়, আছেন? আচ্ছা আচ্ছা। বাবা সত্য।'

সত্য হেমন্তর মুখে অসহায় ভাবে চায়। হেমন্ত যেতে ইশারা করলে গুটি গুটি পা বাড়ায়।

ইশারায় না গেলে নিজেই সে সত্যকে ঠেলে দিত। তারপর, চাই-কি, জলন্ত প্যাকাটির বাণ্ডিলটা ওর হাতে ধরিয়ে দিয়ে লেখা মকশো করাতে ছোট ছেলের হাত মুঠো করে পেন্সিলটা যেমন স্লেটের উপর চেপে ধরে তেমনি করে প্যাকাটির আগুন বন্ধুর মুখে চেপে ধরত।

বন্ধু! যে-বন্ধু এখন লাশ হয়ে আছে। ছাই হবার জন্যে কাঠের পাঁজা বুকে নিয়ে চিৎ হয়ে আছে। স্বর্গে যাবার জন্যে আকাশকে তাক করে আছে।

কর্তব্য। বন্ধুর প্রতি এই ছিল তার অন্তিম কর্তব্য!

বলহরি হরিবোল!

সত্য চোখ বুজে মুখ বিকৃত করে শরীর সিটিয়ে অবনীর মুখে আগুন ছোঁয়ায়।

বলহরি হরিবোল।

আহা! অবনীটা যদি ক্ষণিকের তরে এখন বেঁচে উঠত! এই দৃশ্যটা বারেক দেখে যেত! অবনীর যে বড় সাধ ছিল পরের জন্মে প্রীতিকে বউ হিসেবে পাবে। সত্যকে ছেলে হিসেবে। প্রীতির, খাঁটি ঘিয়ের মতই খাঁটি বউ এবং খাঁটি ছেলে হিসেবে।

বলহরি হরিবোল!

হেমন্ত পিছু হটে। ফের কান্নার কাঁদুনি জুড়েছে অনাদি। অনিমেষ দুহাতে মুখ আগলে ফোঁপাচ্ছে। সত্য ফোঁপাচ্ছে। ভবতোষ চোখ কচলাচ্ছে। এর ওপর কানফাটা হরিধ্বনি এবং ধোঁয়ার যা দাপট! পিছু না হটে উপায়?

'হেমন্তদা!'

হেমন্ত বর্তে যায়: ভাগ্যিস হীরেন ডেকে নিয়ে এল, নইলে হাঁ করে বন্ধুপোড়া দেখতে হত।

শুধু দেখা নয়, থেকে থেকে হা হুতাশও করতে হত—নেহাত যদি না-ই কাঁদে কাঁদুনেগুলোকে সামলাবার জন্যে জগৎ সংসারের অনিত্যতা সম্পর্কে ধরতাই বুলিও কিছু কিছু কপচাতে হত। কেন না সে না কাঁদলে অনাদি কেঁদে মাৎ করত। সামলাবার লোক পাশে আছে জানলে মাতাল যেমন বেপরোয়া মাতলামিতে মেতে ওঠে।

'আপনাকেই খুঁজছিলাম।'

'বরানগরে বুঝি সুবিধে হয়নি?'

'বরানগর? অ, কবির ওখানে? না, সেখানে আর যাওয়া হল কোথায়।' হীরেন হাতের সিগারেটটা টুসকি মারার কায়দায় ছুঁড়ে দেয়। 'চলুন গাড়ির মধ্যে গিয়ে বসা যাক। আপনার সঙ্গে দরকার আছে।'

'আমার সঙ্গে দরকার? কী ব্যাপার?'

'উঠুন না, বলছি।' হেমন্তকে শ্মশানের বাইরে নিয়ে আসে হীরেন,

গাড়িতে তুলে দিয়ে নিজেও ওঠে। ড্রাইভারকে বলে গাড়ি এগিয়ে ট্রাম ডিপোর কাছে নিয়ে যেতে।

হেমন্ত হাঁ হাঁ করে ওঠে, 'আমি চলে গেলে ওঁরা কী ভাববেন।'

'চলে যাচ্ছেন কোথায়। মিনিট পনেরর মধ্যেই আপনাকে ছেড়ে দেব। এখানে থাকলেই ঝামেলা। কথা বলার জন্যে একটু নিরিবিলি দরকার। সিগারেট খাবেন? আপনি তো আবার উইল্স খান না।'

সিগারেট ধরায় হীরেন।

সিগারেট খাওয়ার কথা উঠলেই পেটে পাক দেয়, তবু হেমন্তকেও পকেট থেকে চার মিনারের প্যাকেট বার করতে হয়: চেন-স্মোকার হীরেন যতক্ষণ থাকবে মুখের কাছে মুখ এনে কথা বলতে গিয়ে ভক ভক করে মুখে ধোঁয়া ছাড়বে। পরের এঁটো ধোঁয়া গেলার হাত থেকে আত্মরক্ষায় উপায় নিজেও সিগারেট টানা। সম্ভব হলে পাল্টা ধোঁয়ার ঝাপটা মারা।

হীরেন বলে, 'হল কি জানেন, বরানগরে যাব বলে তৈরি হয়ে বেরিয়েছি, রাস্তায় মিশিরজীর সাথে দেখা হয়ে গেল। আপনাকে বলতে আপত্তি নেই—পোর্টে মিশিরজীই আমার সোর্স। ওর কাছে সেনসেশনাল একটা স্মাগলিংয়ের স্টোরি পেয়ে গেলাম। কয়েকজন কর্তা ব্যক্তি এর সঙ্গে জড়িত। মিশিরজী সন্ধ্যেবেলা এনগেজমেণ্ট করল, কয়েকটা ডকুমেণ্টের ফটোস্ট্যাট কপি দেবে, দেনাপাওনাটাও তখন হবে। আফিসে গেলাম, চীফকে বললাম। কদিন বড় ডাল যাচ্ছে। পার্লামেণ্ট নেই, অ্যাসেমব্লি নেই ছোটখাট একটা মুভমেণ্ট পর্যন্ত নেই—চীফ শোনা মাত্র লাফিয়ে উঠল।'

'এটা তুমি তাহলে কভার করছ না?'

'আপনি তো জানেন হেমন্তদা', নাকে-মুখে ধোঁয়া ছাড়ে হীরেন, 'হীরেন রায় কোন কাজের ভার নিলে পিছু হটে না। এই দেখুন।' পকেট থেকে কয়েক শীট কাগজ বার করে, 'রিপোর্ট আমার কমপ্লিট। সন্ধ্যের পর সময় পাব না বলে এখনই লিখে ফেললাম। শুধু যারা শ্মশানে আসবে তাদের নামগুলো অ্যাড করে দিলেই চলবে। কুমারকে বলেছি—রাতে ও গিয়ে নামগুলো আমায় দিয়ে আসবে। কিন্তু রিপোর্টটা আপনাকে একবার পড়ে দিতে হবে, হেমন্তদা।'

'আমায় আবার কেন—'

'জানেন তো আমি পলিটিকসের ছাত্র—সাহিত্যটা ঠিক আসে না। অবিশ্যি এ রিপোর্টে,' হীরেন চোখ মটকায়, 'আপনারও বেশ-কিছু অবদান আছে!'

'তোমার রিপোর্টে আমার অবদান!'

হীরেন খুক খুক করে হাসে। সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বলে, 'জগদানন্দ এ যাত্রা টিকে গেল। ওর জীবনী ও সাহিত্য নিয়ে ঠাসা আড়াই গেলি ম্যাটার—নিউজ এডিটার আজ ডেস্ট্রয় করতে বলে দিল। আমি দেখলাম আপনার অমন চমৎকার রিপোর্টটা বরবাদ হয়ে যাচ্ছে, তাই ওর থেকেই খানিক খানিক নিয়ে—।' হীরেন খুক খুক করে হাসে।

'কাজটা আইডিয়াল জার্নালিস্ট সুলভই করেছ। কিন্তু', হীরেনের মুখে পিচকারির মত করে ধোঁয়া ছেড়ে হেমন্ত বলে, জগদানন্দ বিখ্যাত লেখক, আর অবনীকে কজন চিনত? ওর সম্পর্কে আমি যা লিখেছিলাম অবনীর ক্ষেত্রে সেটা খাটানো কি—'

'খাটাতে জানতে হয়। আপনি একবার পড়েই দেখুন না দাদা।'

'তাছাড়া জগদানন্দ লেখে গল্প-উপন্যাস, আর অবনী নিছক কবি।'

'কিন্তু দুজনেই তো সাহিত্যিক, নাকি? একই গোত্র তো? ট্যারা-মন্ত্রী মাহিষ্য সম্মেলনের জন্যে বক্তৃতা লিখিয়ে নিয়ে গিয়ে যখন শুনল ওটা মাহিষ্য নয় সাহিত্য সম্মেলন তখন সেই বক্তৃতাতেই না দিব্যি ম্যানেজ করে এল? আপনিই তো দাদা সেই সম্মেলন কভার করেছিলেন—হাততালির কমতি হয়েছিল কিছু?'

মোক্ষম যুক্তি! হেমন্ত ফ্যালফ্যাল করে হীরেনের মুখের দিকে চেয়ে থাকে: হীরেন কি তবে সংবাদিকতার ফাঁকে ফাঁকে মন্ত্রী হওয়ার মতলব ভাঁজছে? মন্ত্রিগিরির মহড়া দিচ্ছে? কিন্তু হীরেন না লেখাপড়া জানা শিক্ষিত ছেলে? সৎচরিত্র? হীরেন না ভদ্রভাবেই জীবন কাটাতে চায়?

'হেমন্তদা, প্লিজ!' লেখা কাগজগুলি হেমন্তর হাতে গছিয়ে দেয় হীরেন। অগত্যা হেমন্তকে পড়তে হয়।

একটানা পড়ার মতই ঝরঝরে লেখা: জগদানন্দের মৃত্যু নিয়ে যে উচ্ছ্বাস উগরে হেমন্ত তার রিপোর্টের ডি-সি সামারি ফেঁদেছিল, সেটা প্রায় হুবহু আছে। শোকযাত্রা ও শ্মশানের বর্ণনাও অনেকখানি। 'জনৈক বিশিষ্ট লেখক বলেন,' 'জনৈক বিখ্যাত কবি বলেন,' 'জনৈক প্রখ্যাত সমালোচক বলেন,' 'সুপরিচিত এক সম্পাদক বলেন' বলে জগদানন্দ সম্পর্কে যেসব 'হিউম্যান টাচ' সম্বলিত গালগল্প সে ছেড়েছিল, তাও অক্ষত।

তবে হীরেনের নিজের অবদানও বড় কম নেই। তার মৌলিকতায় চোখ হেমন্তর কপালে ওঠে: কী কাণ্ড! অবনী তার বন্ধু অবনী এমন একটা ডাকসাইটে কবি ছিল আর হেমন্ত কিনা এতদিনে তার বিন্দুবিসর্গও টের পায়নি!

এই রিপোর্ট তার বন্ধু সম্পর্কেই লেখা হত? তার বন্ধু অবনী সম্পর্কে?

কিন্তু যে-কাগজে কাল অবনীর গুণপনার ঢালাও ফিরিস্তি বেরোবে সেই কাগজই কি প্রত্যেক পুজো সংখ্যায় অবনীর কবিতা পত্রপাঠ বাতিল করেনি? সেই কাগজে অবনীর বইয়ের দু লাইন রিভিউ বার করতেই কি হেমন্তকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়নি?

আজ অবনীর মৃত্যু নিয়ে মাতামাতি করছে যে-নিউজ এডিটার সে-ই কি অবনীর কবিতা নিয়ে এতদিন ঠাট্টা করত না? অবনীর সঙ্গে সঙ্গে হেমন্তকেও—তার লিটারারী এজেন্ট বলে? ল্যাংড়া কবির মাতাল টাউট বলে?

'হেমন্তদা?'

'ফার্স্ট কেলাস হয়েছে।'

খবরের কাগজ ফোর্থ এস্টেট। ফোর্থ এস্টেটে সবই সম্ভব। হেমন্তর কি অত সহজে অবাক হওয়া সাজে! অনেক-ঘাটের-জল-খাওয়া ফোর্থ এস্টেটের বছর কুড়ির পাইক হেমন্ত।

পৃষ্ঠা সংখ্যা মিলিয়ে পাতাগুলি গুছিয়ে ফিরিয়ে দেয় হেমন্ত।

কিন্তু এতো প্রায় কলম দেড়েকের ধাক্কা। এত বড় রিপোর্ট—'

হীরেন বলে, 'নিউজ এডিটার ছবি সমেত দু কলম স্পেস অ্যালট করেছে। অনেকদিন কোন লেখক মরেনি, তার ওপর জগদানন্দ অত আশা

দিয়েও শেষ পর্যন্ত ডোবাল—হেঁজিপেজি লেখকের মৃত্যুর খবরও পাবলিকে এখন লুফে নেবে।'

হীরেন আরও কি বলতে যাচ্ছিল, বাধা দিয়ে হেমন্ত বলে, 'জগদানন্দ শ্মশানে আসছে তো? উঁহু, মাথা নাড়লে কী হবে—বাণীর জন্যে তুমি ওঁকে ফোন করেছিলে না? তবে! ও যখন শুনেছে এক কবিকে এখানে পোড়াতে আনা হয়েছে, দেখ, লোকের কাঁধে ভর দিয়ে হলেও নির্ঘাত আসবে। রবি ঠাকুরের চিতার পাশের জায়গাটিতে যাতে আর কোন লেখকের চিতা না জ্বলে—সেটা পাহারা দেবার জন্যে না এসে কখনই পারবে না।'

'ওই জায়গাটাতে বুঝি ওঁর বড্ড লোভ?'

'লোভ নয়, দাবি। সাহিত্যিক উত্তরাধিকারের দাবি। রবি ঠাকুর বাঙালী লেখক উনিও বাঙালী লেখক—উত্তরাধিকার না বর্তে যায়। বিশ্বামিত্রের ব্যাটা চামচিকে হলেও—'

'কিন্তু যাই বলুন হেমন্তদা, জগদানন্দের বদলে অবনীবাবুর মৃত্যুতে একটা সুবিধা হয়েছে। জগদানন্দ লেখককুলের ডালমিয়া। ওর মৃত্যু নিয়ে সাহিত্যিকদের দুর্দশা সম্পর্কে লেখার কোন স্কোপ ছিল না। কিন্তু এখানে আমি গভর্নমেণ্টকে একচোট নিয়েছি, লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়? চীফ সেদিন বলছিল না ইলেকশনের অনেক দেরি, এখন বাঁ দিক ঘেঁষে চলতে হবে? আমিও তাই—'

'সে-সব দিক দিয়ে রিপোর্টে কোন ত্রুটি নেই। শুধু কয়েকটা ফ্যাকচুয়াল মিসটেক—'

'ফ্যাকচুয়াল মিসটেক?' হীরেন নড়েচড়ে বসে।

উদাস সুরে হেমন্ত বলে, 'তুমি বোধ হয় জানো না হীরেন, অবনী চাটুয্যে বলে দুজন কবি আছে—পা-কাটা অবনী আর কালো অবনী। দুজনে এক বয়েসী হলেও কালো অবনী আধুনিক কবি। 'নগ্ন নির্জন' তারই কবিতার বই।'

'অ্যাঁ!'

'হ্যাঁ। ওর ওই একটিই বই। আরও আধুনিক হবে বলে কালো অবনী এখন কবিতা লেখা মুলতুবি রেখে ফরাসি শিখছে। আর পা-কাটা অবনীর বই চারটি। 'ফুলের দিন', 'বসন্ত রজনী'—'

'সেরেছে!' হীরেন জিভ বার করে। 'আমি যে লাইব্রেরী থেকে এরই বই ভেবে 'নগ্ন নির্জন' আনিয়ে তার থেকে বেছে বেছে কোটেশান দিলাম। অক্ষয় চাটুয্যের মত মিলমালিকের ছেলের এমন আধুনিক মন বলে—কী কেলেঙ্কারিয়াস কাণ্ড! চীফও তো বলল—'

'চীফ বলেছে? তাহলে ও. কে.।'

'না না. ঠাট্টা নয় হেমন্তদা। এখন কী করি তাই বলুন। এত কষ্ট করে লিখলাম—'

'এই রিপোর্টই ছেপে দাও। আমি গ্যারাণ্টি দিচ্ছি, কিসসু হবে না।' অভয়ের ভঙ্গিতে হাত তোলে হেমন্ত। 'যা মুখরোচক পাবলিকে তাই নেবে। নির্ভেজাল সত্যি জোলো হয়ে যায়।'

'তবু আপনি ঠাট্টা করছেন!' হেমন্তের হাত হীরেন জড়িয়ে ধরে। 'প্লিজ! আপনি একটু কাটসাট করে দিন, আমায় উদ্ধার করুন।'

'আমি বলছি—'

'দোহাই আপনার!'

হীরেন বিশ্বাস করছে না? হেমন্তর আন্তরিক কথাটাকে ঠাট্টা ভাবছে?

কিন্তু এই কথাগুলি কি হেমন্তর?

একদিন এই কথাগুলি বলেই হেমন্তকে যে সাংবাদিকতার সার কথা বুঝিয়ে দিয়েছিল দেশমান্য সর্ববরেণ্য সেই সাংবাদিক শিরোমণিকে কি হীরেন ঠাট্টা করতে পারত? হেমন্ত পেরেছিল?

নির্ভেজাল সত্যি জোলো হয়ে যায়। যা মুখরোচক পাবলিক তাই নেবে। এটাই ছেপে দাও।—তারই একটি রিপোর্ট সম্পর্কে সেই সাংবাদিককুলতিলক একদিন বলেনি? তার যে-রিপোর্ট বেরোবার সাথে সাথে কলকাতায় নতুন করে দাঙ্গা বাধে। কয়েক শো লোক খতম হয়ে যায় যে-দাঙ্গায়।

অবশ্য শ কয়েক লোককে খতম না করলে বাঁচার উপায় ছিল না 'সত্য-বার্তা'র: 'বিশ্ববন্ধু' খুলনার খবর ছেপে বাজার দখল করেছে। নিজস্ব সংবাদদাতার টাটকা-টাটকা খবর। এদিকে 'সত্যবার্তা' নিজেই নিজের পায়ে কুড়োল মেরে বসে আছে—কদিন আগে উৎসাহের চোটে তার নিজস্ব সংবাদ-দাতা চিন্তাহরণ সেন খুন হয়েছে বলে ফলাও করে ছেপে। নতুন নিজস্ব

সংবাদদাতা জোটালে এখন চিন্তাহরণ বেঁকে বসবে, আবার এত তাড়াতাড়ি চিন্তাহরণকে বাঁচিয়ে তুললে কাগজেরও প্রেস্টিজ থাকে না।

দিনকে দিন হু-হু করে 'সত্যবার্তা'র সার্কুলেশন পড়ছে। সার্কুলেশন ডিপার্টমেণ্ট সব দোষ চাপায় নিউজ ডিপার্টমেণ্টের ওপর। অ্যাডভার্টাইজ-মেণ্ট ডিপার্টমেণ্ট নিজেদের অক্ষমতার জন্যে এতদিন মরমে মরে ছিল—তারাও এখন সুযোগ পেয়ে কথা শোনায়। হকাররা অবধি যা-তা বলে। নিউজ এডিটার উদভ্রান্ত। চীফ-রিপোর্টার ক্ষ্যাপা কুকুর। রিপোর্টার, সাব-এডিটার, অ্যাসিস্টেণ্ট এডিটাররা মাথায় হাত দেয়: জার্নালিজম কিনা মিশনারী ওয়ার্ক—সবাইকে দিয়ে-থুয়ে টাকা বাঁচলে তাদের মাইনে। স্বামীর ঘর না করলেও সধবা থাকার মত মাইনে না পেলেও চাকরিটা আছে—সেই সুবাদে ধার মেলে, মাঝে-মধ্যে এখানে-ওখানে ভালো-মন্দ খাওয়া জোটে। কিন্তু যেভাবে সার্কুলেশন যাচ্ছে, কাগজ যদি লাটে ওঠে—উপায়? প্রেসের লোকেরা অন্য প্রেসে, অফিস-স্টাফ অন্য অফিসে চাকরি পাবে। পাক না পাক—চেষ্টা করতে পারবে। দারোয়ান বেয়ারাদেরও চাকরির অভাব হবে না। কেননা ওদের সকলেরই যোগ্যতা আছে। কিন্তু জার্নালিস্ট? না টাইপরাইটিং, না শর্টহাণ্ড, না বুককিপিং কিছুই জানে না। সময় মত অফিসে হাজরে দেওয়া পর্যন্ত ধাতে নেই। নির্গুণ এই ব্রহ্মদের উপায়?

কাগজ উঠে গেলে গোপল দত্তরা অবিশ্যি দম ফেলে বাঁচবে: কাগজ বের করার উদ্দেশ্য মাঠে মারা গেছে। কাপড়ের হ্যাণ্ডলিং এজেন্সিটা দূরে থাক ছোটখাট পারমিট-কণ্ট্রাক্ট অবধি বাগাতে পারেনি। মিনিস্ট্রির রদ-বদলের সঙ্গে গোপাল-গোষ্ঠীরও কপাল ভেঙেছে। সুতরাং কাগজের পেছনে আর টাকা ঢেলে ফায়দা? অথচ বন্ধ করে দিলে হাঙ্গামা-হুজ্জোত হবে। এমতাবস্থায় সার্কুলেশন শূন্য হয়ে কাগজ যদি উঠে যায়—গান্ধীভগবানের আশীর্বাদ বলতে হবে।

সেই দুর্দিনে 'সত্যবার্তা'র সহকর্মীদের উদ্ধার করেছিল হেমন্ত: সামনে খুলনার ম্যাপ খুলে রেখে রাত জেগে এক রিপোর্ট খাড়া করল—'খুলনা-প্রত্যাগত স্টাফ রিপোর্টার' প্রদত্ত রিপোর্ট। পরের দিন সকালে সেই রিপোর্ট নিয়ে ছুটল সম্পাদকের বাড়ি। আশঙ্কা ছিল, ব্যাপারটা টের পাওয়া মাত্র

উনি না রিপোর্ট ছুঁড়ে ফেলে বাড়ি থেকে তাকেও বের করে দেন। বামপন্থী প্রগতিবাদী সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী বলে অত যাঁর নামডাক—তিনি কি এই রিপোর্ট সহ্য করবেন? এ ভাবে তৈরি রিপোর্ট?

মিথ্যা আশঙ্কা।

: চমৎকার হয়েছে। এক-আধটু ফ্যাকচুয়াল মিসটেক অবিশ্যি আছে—তা এই ডামাডোলের মধ্যে ওসব আর কেউ খেয়াল করবে না। যাও, এক্ষুনি গিয়ে প্রেসে দিয়ে দাও। কাল এটা লীড হবে, সাত কলম ব্যানার।

: কিন্তু শেষে যদি কোন গোলমাল—

: গোলমাল! পাকিস্তানে কাগজ ব্যান করবে? করুক। আমরাও তো তাই চাই। শ খানেক কাগজ তো যায়, ব্যান করলে বরং ভালো একটা পাবলিসিটি হবে, এদিকে সার্কুলেশন বাড়বে।

: তা নয়। আমি বলছিলাম কি সত্যিসত্যিই তো আর—

: সত্যি! যা মুখরোচক তাই পাবলিকে নেবে এবং যা পাবলিকে নেবে তাই সত্যি। আর নির্ভেজাল সত্যি জোলো হয়ে যায়—মনে রেখ।

সেই রিপোর্ট ছাপা হল। তার ফলে শ-কয়েক লোকের, 'আজাদ'-এর মতে হাজার দশেক, প্রাণ গেল বটে তবে ওরই ধাক্কায় সত্যবার্তার সার্কুলেশনের পারা চড় চড় করে চড়ে গিয়েছিল। 'সত্যবার্তা'র আর আর রিপোর্টাররাও প্রেরণা পেয়েছিল।

তিলকে তাল করার প্রেরণা।

উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপাবার প্রেরণা।

হেমন্ত শুধু দিন কয়েকের জন্যে গুম হয়ে গিয়েছিল।

কেননা একটি দুঃস্বপ্ন দিন কয়েক তার মনে হানা দিতে শুরু করেছিল: সে খেতে বসেছে। সামনে মস্ত বড় একটা থালা, থালায় ভাত নেই। চারপাশে হরেক ব্যঞ্জনের বাটি সাজানো। কিন্তু ভাত ছাড়া খাবে কি? ঘরে কেউ নেই। দরজার বাইরে অনেকের ফিশফাশ। অস্বস্তিকর অচেনা পরিবেশ। খানিক ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত অধীর হয়ে ভাতের জন্যে ডাকতে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকল এক নারী—চুলের মুঠি ধরে সদ্য-কাটা রক্ত-ঝরা একটা নরমুণ্ড এনে থপ করে নামিয়ে দিল তার থালায়।

তারপর তাকাল হেমন্তর মুখের দিকে।

হাসল। ভুবনমনমোহিনী হাসি।

চেনে। চেনে। দুঃস্বপ্নের এই নারীকে হেমন্ত চেনে। একেই একদিন সে স্বপ্ন দেখত—জনকজননিজননী। নীলসিন্ধুজলধৌতচরণতল অনিল-বিকম্পিত-শ্যামল-অঞ্চল অম্বরচুম্বিতভালহিমাচল শুভ্রতুষারকিরিটিনী। ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে। স্বপ্নে দেখত—তার শিয়রে-টাঙানো ভারতবর্ষের ম্যাপ থেকে ওর ছবিটা তেরঙ্গা ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে জীবন্ত হয়ে নেমে এল। হেমন্তর পাশে এসে দাঁড়াল। হেমন্তর কপালে হাত রাখল। যাদুকরী ওর স্পর্শে তার সমস্ত দৈহিক যন্ত্রণা মুহূর্তে দূর হয়ে গেল। পরম প্রশান্তিতে এবার চোখ বুঝতে পারবে হেমন্ত। পুলিশের গুলীতে মুমূর্ষু হেমন্ত।

আঁখি মেলে তোমার আলো প্রথম আমার চোখ জুড়ালো, ওই আলোতেই নয়ন রেখে মুদব নয়ন শেষে।

শহীদ হওয়ার সাধ হেমন্তর আকৈশোরের। স্বপ্নে সেই শহীদের মৃত্যু বরণ করত।

তারপরেও ওই নারীকে দেখেছে কতবার: তার রাজরাজেশ্বরী ফুটপাথে মরা-ছেলে কোলে করে আকাশের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে আছে। ছেলের মুখে মাই গুঁজে দিয়ে কঙ্কালসার হয়ে মরে পড়ে আছে। অসুস্থ স্বামীকে পাশ ফিরিয়ে রেখে ব্যাফেল ওয়ালের আড়ালের অন্ধকারে অভিসারে চলেছে।

দুঃস্বপ্ন?

স্বপ্ন আর দুঃস্বপ্ন একই জিনিসের এপিঠ-ওপিঠ।

'হেমন্তদা?'

স্বপ্ন দেখে বোকারা। দুঃস্বপ্ন ভীরুরা।

'অ হেমন্তদা?'

হরিপদদার কথাই ঠিক: সোনাগাছি আর সাংবাদিকের সতীত্ব এনা-মেলের পাথরবাটি।

'কথা বলেন না কেন?' হীরেন এবার গায়ে খোঁচা দেয়।

হেমন্ত গা ঝাড়া দিয়ে কাগজগুলোর দিকে তাকায়।

'দাঁড়াও, আরেকবার পড়ে নিচ্ছি।'

'পড়ছিলেন কি চোখ বুজে! একটু তাড়াতাড়ি করুন। বললাম না মিশিরজীর সঙ্গে এনগেজমেণ্ট আছে। আপনি শুধু ফ্যাক্টের ভুলগুলো ধরিয়ে দিন।'

হেমন্ত প্রশ্ন তোলে, 'কিন্তু তাতে যদি রিপোর্ট রিরাইট করতে হয়?'

'করতে যদি হয় করব। তাই বলে জেনেশুনে—'

'জেনেশুনে ভুল লিখবে না, কেমন? তাহলে রিরাইটই কর—তোমার রিপোর্ট আগাগোড়া ভুল।'

'আগাগোড়া ভুল?'

'শোকযাত্রা বা শ্মশানের ডেসক্রিপশনের কথা ধরছি না। কিন্তু আত্মহত্যার যে কারণ তুমি—'

'সাহিত্যিকদের আর্থিক দুরবস্থা নিয়ে গভর্নমেণ্টকে একহাত নেবার জন্যেই—'

'কিন্তু আত্মহত্যা করার মত দুরবস্থা অবনীর হয়নি। ওর বাবা মিলমালিক ছিলেন, সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে গেলেও বিকলাঙ্গ ছেলের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা তিনি করে গিয়েছিলেন।'

'বেশ। আপনি যখন বলছেন ও জায়গাটা বাদ দেব। তাহলে আত্মহত্যার কারণ তো একটা দেখাতে হয়?'

'সেটা পুলিশের কাজ।' হেমন্ত বলে, 'দ্বিতীয় অক্ষয় চাটুয্যেকে খোঁচা দিয়েছ কেন? মিলমালিক ছিল বলে?'

'শুধু সেজন্যে নয়। বাপ মিলমালিক, ছেলে কবি—এই কনট্রাস্টটা ফোটাবার জন্যেই—'

হেমন্ত মুখে হাসি ফোটায়: আর্থিক দুরবস্থার জন্যে ছেলের আত্মহত্যা, মিলমালিক বলে বাবাকে খোঁচা— রিপোর্টেরই কী কনট্রাস্ট!

মিলমালিকদের ওপরে ভারী রাগ হীরেনের। ওর দাদা ছিল এক মিলের লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার। ভদ্রলোকের ধারণা ছিল লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসারের কাজ লেবারদের ওয়েলফেয়ারের ব্যবস্থা করা।

সেই ধারণার বশে কাজ করতে গিয়ে খুন হয়ে গেল। পুলিশ প্রথমে গা করেনি, পরে তদন্ত করেও ফল হয়নি। পত্রপাঠ খারিজ হয়ে যায় ওর বৌদির রুজু-করা মামলা।

নিছক ঘটনা হিসেবে সেই খুনের খবরটা শুধু বেরিয়েছিল। কিন্তু খুনের আসল রহস্য এবং খুন করিয়েছে কে জানা সত্ত্বেও রিপোর্টার হীরেন একটি লাইনও লিখতে পারেনি। ওই কোম্পানা বছরে হাজার পঞ্চাশেক টাকার বিজ্ঞাপন দেয় যে!

মিলমালিকের ওপর সেই গায়ের জ্বালাটা হীরেন এখানে মিটিয়েছে। প্রাক্তন এক মিলমালিকের ওপর।

'হাসছেন কেন?' ক্ষুণ্ণ স্বরে হীরেন শুধায়।

'তুমি ভুল করেছ হীরেন। মিলমালিক বলতে আমরা আজ যা বুঝি অক্ষয় চাটুয্যে তা ছিল না। কারখানায় গুলী চলতে, তাও কেউ মরেনি, ম্যানেজারের ওপর সে খাপ্পা হয়ে যায়, ছেলের মুখ দেখা বন্ধ করে, শেষ অবধি কারখানাই বেচে দেয়।'

'আপনি দেখছি অক্ষয় চাটুয্যের ভক্ত।' হীরেন চিবিয়ে চিবিয়ে বলে, 'ছেলেবেলায় আমরাও অবিশ্যি পাঠ্যপুস্তকে সেই ক্ষণজন্মা পুরুষের—'

কথা কেড়ে নিয়ে হেমন্ত বলে, 'এটা ভক্তির কথা নয়—স্টেটমেণ্ট অব ফ্যাক্টস। অক্ষয় চাটুয্যে মিলমালিক হলেও তার একটা হৃদয় ছিল। মানবিক সততা—'

'কিন্তু ক্ষণজন্মা সেই সৎপুরুষপ্রবর তো শুনেছি নোট জাল করে—'

'মিথ্যে নয়। পুঁজির জন্মই পাঁকে। বলতে পারো, দুনিয়ার কোন্ কার-বারের পুঁজি জাল-জোচ্চুরি বা এক্সপ্লয়টেশন ছাড়া যোগাড় হয়েছে? নোট জাল করে অক্ষয় কারখানার ভিৎ গড়েছিল, শ্রমিকদের এক্সপ্লয়েট করেই সেই কারখানার শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল—তবু সে শ্রমিকদের মানুষের মর্যাদা দিয়েছিল, তাদের সঙ্গে একটা আন্তরিক সম্পর্ক বজায় রেখেছিল।'

'বুঝলাম।' হীরেন বলে, 'ফিউডাল মন আর ক্যাপিটালিস্ট মস্তিষ্ক।'

'না, ওটা আজকের ইণ্ডিয়ান ক্যাপিটালিস্টদের সম্পর্কে প্রযোজ্য—তেজা-রতি কারবারের মন নিয়ে যারা বড় বড় কারখানার মালিক হয়ে বসেছে।

শ্রমিকদের সামান্যতম দাবিদাওয়া সম্পর্কেও যারা ছ্যাঁচরামোর চূড়ান্ত করে।'

'সবে-স্বাধীন কলোনিয়াল কান্ট্রিতে—'

'জানি, এমন হয়। স্বীকার করি, আস্তে আস্তে এরাও বদলে যাবে। কিন্তু আমি তো আগেই বলেছি হীরেন—আমার কথাগুলি স্টেটমেণ্ট অব ফ্যাক্টস মাত্র। পুঁজিবাদ মানুষকে অমানুষ বানায়—মালিককেও বানায় শ্রমিককেও বানায়। কিন্তু অক্ষয় চাটুয্যেকে পারেনি। যে-মুহূর্তে সে দেখল তার অবস্থাটা ডাক্তার ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের মত হয়ে উঠছে, তারই হাতে-গড়া কারখানা তারই ঘাড়ে চেপে বসার যো করছে, এতদিন সে কারখানা চালিয়ে এলেও এখন কারখানার প্রয়োজনে তাকে চলতে হবে—অক্ষয় চাটুয্যে বিদ্রোহ করেছিল। পুঁজিবাদ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্রষ্টা বলে আমরা গদগদ হয়ে উঠি, কিন্তু এটা যে কতবড় একটা বুজরুকি—'

ছোকরাকে জোর একটা লেকচার শোনানো গেছে—হীরেনকে বিদায় দিয়ে নিজেকে তারিফ করে হেমন্ত। পারে তো নিজেই নিজের পিঠ চাপড়ায়।

এ ছাড়া উপায় ছিল না। বড় বড় বুকনির চোটে ওকে ঘাবড়ে দিতে না পারলে ওই রিপোর্ট তাকেই লিখতে হত। যে-ভাবে এখান-ওখান থেকে খানিক-খানিক খাবলে নিয়ে তিলোত্তমা রিপোর্টটা পরদা করেছিল!

শেষ পর্যন্ত ওই রিপোর্ট লেখার দায়িত্ব সে-ই না নিয়ে পারত না। অবনী যে হেমন্তর বন্ধু। বন্ধু-কৃত্য করা উচিত নয়? বন্ধুর শেষকৃত্য?

বন্ধু! আধখানা যার দেহটা কাঁটা-ছেড়ার পর পুড়ে এতক্ষণে সিকিখানা হয়ে এসেছে তার প্রতি আর কিসের দায়িত্ব? বন্ধু কি কাল হেমন্তর রিপোর্ট পড়ে বাহাদুরি দেবে? হেমন্ত যদি এখন ক্যানাস্তারা পিটতে পিটতে বন্ধুর গুণ গেয়ে বেড়ায় বন্ধু টের পাবে?

তাহলে আর কোন্ প্রয়োজন বন্ধুকৃত্যে?

বন্ধু মরে তাকে রেহাই দিয়ে গেছে বলে হেমন্ত যখন বাঁচল ভাবছে, হীরেন কিনা তখন তাকে ফাঁসাতে চাইছিল।

তার থেকে ছাপা হোক ওই রিপোর্ট। মরে একচোট বিখ্যাত হয়েছে অবনী, মরার খবরের দৌলতে হোক আরেক চোট।

বরং এ-ব্যাপারে হেমন্তরও যে কিছু হাত থাকল—এও এক সান্ত্বনা : যতদিন অবনী বেঁচে ছিল অক্ষয় চাটুয্যের কাছে কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করেছে, মরার পর ফাউ দিয়ে দিল।

এর জন্যে আবার স্বর্গীয় বাপ-ব্যাটা না হেমন্তর ওপর পাল্টা কৃতজ্ঞ হয়ে ওঠে!

মন্দ হয় না তাহলে কিন্তু : জ্যান্ত লোকের কৃতজ্ঞতার বোঝা বহার শেষ হয় একদিন—মরলে। যেমন অবনী মরতে তার হয়েছে। হেমন্ত মরলেও হত। কিন্তু স্বর্গীয় লোকের ঘাড়ে যদি একবার কৃতজ্ঞতার ভূত ভর করে রক্ষে নেই।

শ্মশানের দিকে যেতে যেতে হেমন্ত থমকে দাঁড়ায় : তাহলে কি আফিসে যাবে? গিয়ে সেই রিপোর্টটা নতুন করে লিখে দিয়ে আসবে? স্বর্গীয় বাপ-ব্যাটাকে কৃতজ্ঞতার ফাঁসিতে লটকে দেওয়ার পাকাপাকি ব্যবস্থা করে আসবে? এতগুলি বছর তাকে কৃতজ্ঞতার ঘানিতে বেঁধে ঘোরানোর শোধ তুলবে?

চীফ রিপোর্টারও তাহলে খুশী হবে—ছুটি নিয়ে এসেও যদি কাগজের ভালোর জন্যে কাজ করে দিয়ে আসে।

চীফ রিপোর্টার! ওই চীফ রিপোর্টারের প্রতিও কৃতজ্ঞ হেমন্ত : ওরই দৌলতে এই চাকরি।

স্বর্গীয় বাপ-ব্যাটাকে ফাঁসাতে চাওয়াটা তাহলে অজুহাত? আসলে চীফ রিপোর্টারের প্রতি কৃতজ্ঞতাটা এখন ঘাই দিয়ে উঠেছে? যে-কাগজ তাকে খেতে-পরতে দেয় সেই কাগজে একটা ভুল রিপোর্ট ছাপা হবে বলে মনটা খচ খচ করছে?

হায়! হায়! হায়! অবনী মরলেও তবে মুক্তি নেই!

'হেমন্তদা!' হাঁক ছেড়েই চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে আসে শক্তিরা।

'কোথায় গিয়েছিলেন বলুন তো? খুঁজে খুঁজে আমরা হয়রান। কুমার বলল বটে যে হীরেনের সঙ্গে আপনি চলে গেছেন। কিন্তু চলে যাবেন, কাউকে কিছু না বলে, আমরা ভাবতেই পারিনি।'

'চলে যে যাইনি তা তো দেখতেই পাচ্ছ।' হেমন্ত বলে 'তা আমায় খুঁজে খুঁজে হয়রান কেন ?'

'ওদিকে যে তুলকালাম কাণ্ড।' তপন বলে, 'দেখুন গিয়ে—শ্মশানে এক সাহিত্যিক সম্মেলন ঘটেছে। অনাদিবাবু কাউকে চেনেন না, সবাইকে খাতির-যত্ন করতে গিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছেন।'

'তোমরা তো ছিলে।'

অমিতাভ বলে, 'আমরা! শোল-বোয়ালের ভিড়ে চুনোপুঁটি!'

'কে কে এসেছে ?'

'কে আসেনি !' চিরঞ্জীব গড় গড় করে এক গাদা নাম বলে যায়। নাম বলা শেষ করে ভুরু নাচিয়ে ঘাড় কাৎ করে।

'ওঁরা জানলেন কী করে ?'

শক্তি বলে, 'হারেন অফিস থেকে কাকে কাকে ফোন করেছিল, বাকিটা ত্রিদিবের কাজ। কথা শিল্পীরা তো গল্পস্বল্প করার অজুহাতে সারাদিনের কেনাবেচার খোঁজ নিতে সন্ধ্যেবেলায় বই-পাড়ায় জোটে, ত্রিদিব করেছে কি—'

ত্রিদিব বলে, 'অবনীবাবু কবি বলেই সুবিধে হয়েছে হেমন্তদা। কেননা গল্প-উপন্যাস লিখিয়েরা কোন কোন কবির নাম শুনলেও কে কত বড় কবি কী রকম কবি কিছুই জানে না। তাই—'

অমিতাভ বলে, 'অর্থাৎ ওরা মনে করে লিখে যারা গাড়িবাড়ি করতে পারে না তারা আবার লেখক !'

'তাই! ওঁরা যখন শুনল শ্মশানে রিপোর্টার যাচ্ছে, ফটোগ্রাফারও যেতে পারে, ভাবল না-জানি কী জাঁদরেল কবি অবনীবাবু। এরপর শ্মশানে না গেলে চলে! আমিও উসকে দিলাম।'

শক্তি বলে, 'ত্রিদিবটা যে এমন কাজের কে জানত!'

ত্রিদিব বলে, 'শুধু আমার উসকানিতে অবিশ্যি কাজ হত না যদি-না আপনাদের নিউজ এডিটার বটুকবাবুকে ফোন করতেন। তাঁকেও এই ব্যাপারে খুব ইণ্টারেস্টেড মনে হল, হেমন্তদা। বোধ হয় অবনীবাবু আপনার বন্ধু বলেই।'

ইণ্টারেস্টেড ঠিকই, তবে বন্ধু বলে নয় : রিপোর্টার পাঠাচ্ছে, ফটোগ্রাফার পাঠাচ্ছে— রিপোর্ট লেখার ফটো তোলার মালমশলা যোগাড় করে রাখতে হবে বইকি!

তপন বলে, 'যাই বলো, এই ফাঁকে টেক্কা মেরে দিল কুমার। জানেন হেমন্তদা, হীরেন বলেছিল শ্মশানে যারা আসবে তাদের নামগুলো ওকে দিয়ে আসতে। দেখুন গে কুমারের কী খাতির! কিউ দিয়ে সবাই ওর কাছে নাম লেখাচ্ছে। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের চেয়েও লম্বা কিউ!'

শক্তি বলে, 'মাঝখান থেকে আমাদের প্ল্যানটা পণ্ড হল। আমরা ঠিক করেছিলাম 'কবি'র একটা বিশেষ সংখ্যা'—

'বিশেষ মানে বিশেষ ভাবে শেষ—'

'থাম তুই!' অমিতাভকে ধমক দিয়ে শক্তি বলে, 'অবনী স্মৃতি-সংখ্যা বার করব, সব ঠিকঠাক—'

'অবনী স্মৃতি-সংখ্যা?'

'হ্যাঁ। অনাদিবাবুই সাজেস্ট করেছিলেন, সমস্ত খরচ দেবেনও বলেছিলেন—'

'তোমরা কি ওর কাছে—'

'না না, আমরা কিছুই বলিনি। উনিই যেচে আমাদের সঙ্গে আলাপ করলেন, নিজে থেকে প্রপোজাল দিলেন। আমরাও দেখলাম—'

'অবনী স্মৃতি-সংখ্যা মানে অবশ্য অবনীবাবুর উদ্দেশ্যে লেখা বা অবনী বাবুকে উৎসর্গ-করা কবিতার সংকলন নয়। ওই সংখ্যায় আমরা সবাই অবনীবাবুর মত মিষ্টিমধুর কবিতা লিখব।'

'লিখব কি, লিখতাম বল।' অমিতাভকে তপন শুধরে দেয়। 'আইডিয়াটা চমৎকার ছিল, না হেমন্তদা?'

'দুর্দান্ত একটা এক্সপিরেমেণ্ট হত, না?'

'আমি নাকি ছন্দে লিখতে পারি না। এইবার দেখিয়ে দিতুম—'

হেমন্ত জিজ্ঞেস করে, 'কিন্তু তোমাদের সাধে বাদ সাধল কে? এমন চমৎকার, দুর্দান্ত এক্সপেরিমেণ্টটা হচ্ছে না কেন?

'বটুক সরকারের জন্যে। ঝোপ বুঝে কোপ মারা অভ্যেস, এসেই

অনাদিবাবুকে জপিয়ে ফেলেছে—অবনীবাবুর কাব্য-সংগ্রহ বার করবে। খরচ-খর্চা ফিফটি-ফিফটি। অনাদিবাবুও হিসেবী লোক, তিনি যখন দেখলেন 'কবি'-র অবনী স্মৃতি-সংখ্যার চেয়ে অবনী-কাব্য-সংগ্রহের কদর বেশি, মুখ কাচুমাচু করে প্রস্তাব উইথড্র করে নিলেন।'

বটুক বার করছে অবনীর কাব্য-সংগ্রহ? শক্তিরা ভুল শোনেনি তো?

নামকরা পাবলিশার বটুক। পাবলিশার কাম বুকসেলার। ওর ওখান থেকে যে-বইই বার হোক বিক্রি হবেই : ধারের দাদনে বাংলা দেশের তামাম লাইব্রেরির টিকি যে ওর কাছে বাঁধা। ইচ্ছে না থাকলেও বটুকের সুপারিশমত বই না কিনে তাদের উপায় নেই। এবং লাইব্রেরিকে বটুক বই গছায় বইয়ের গুণাগুণ দেখে নয়, লাভ-লোকসানের হিসেব কষে। বটুক দয়া করলে নিচের লেখক ওপরে ওঠে, বটুক বিরূপ হলে ওপরের লেখক তলিয়ে যায়। কোন লেখকের ওপর চটলে লাইব্রেরি-লিস্ট থেকে তার বইয়ের নাম স্রেফ ও. পি. বলে কেটে দেয় বটুক।

দিনের পর দিন খোশামুদি করেও হেমন্ত এহেন বটুকের ওখান থেকে অবনীর একটি বই-ও বের করতে পারেনি। বলেছে, বই সে নিজে ছেপে-বেঁধে তৈরি করে দেবে, প্রকাশক হিসেবে বটুকের ফার্মের নামটা শুধু থাকুক। তার জন্যে বটুক যা-ইচ্ছে কমিশন নিক, বিক্রির জন্যে কোন তাগাদা সে দেবে না, বিজ্ঞাপন বাবদ একটি পয়সাও বটুককে খরচ করতে হবে না —তবু রাজী হয়নি। বটুকের এক কথা : ভুষি মালের কারবারে সে নেই।

তাছাড়া ছেলেবেলায় তার কোন কোন অথর নাকি পদ্য লিখত, বটুকের ফার্মের নামে কবিতার বই বেরলে তারা যো পেয়ে যাবে। উপন্যাস আদায়ের জন্যে এখন তাদের আত্মজীবনী ছাপতে হচ্ছে, তখন ছেলেবেলার পদ্যগুলিও ছাপতে হবে। গালগল্প ঢুকিয়ে, বড় বড় বকুনি ঝেড়ে, গুলতাপ্পি মেরে বানানো আত্মজীবনী তবু চালানো যায়, কিন্তু পদ্য? ইম্পসিবল্! বটুক সাফ জবাব দিয়েছে। একজনের ছেলেবেলার পদ্য ছাপালে ছেলেবেলায় যে পদ্য লেখেনি তার পত্রাবলী ছাপতে হবে! নইলে হয়ে গেল! অথরদের নিয়ে ঘর করার ঝকমারি হেমন্ত কী বুঝবেন!

'বটুক ছাপছে অবনীর—?' হেমন্তর সন্দেহ তবু ঘোচে না।

'শুধু তাই!' অমিতাভ বলে, 'বইয়ের ভূমিকা কে লিখছে জানেন? হিমাংশু গুপ্ত।'

'হিমাংশু—মানে—'

'আজ্ঞে!'

'রাজী হবে?'

'হয়ে বসে আছে!' শক্তি বলে, 'কমিউনিস্ট বলে ভাবছেন কী করে হল? কিন্তু লাল গুপ্ত যে প্রগতিশীল কমিউনিস্ট—নিজের স্বার্থ ষোল আনা হাসিল করে পার্টিকে মদৎ দেয়।'

তপন বলে, 'বটুকের সঙ্গে লাল গুপ্তর আজকাল গলায় গলায়। এখন থেকে লাল গুপ্তর সব বই বটুকের ওখান থেকে বেরোবে। বটুকও আর মার্কিন খিস্তির অনুবাদ ছাপছে না, প্রোগ্রেসিভ হচ্ছে—রাশিয়ান বইয়ের অনুবাদের বকলমে লাল গুপ্ত নাকি ওকে মোটা রকম পাইয়ে দিচ্ছে—জানেন না? সে কি! খবরের কাগজের লোক হয়েও আপনি দেখছি খবরাখবর কিসসু রাখেন না, হেমন্তদা।'

ত্রিদিব বলে, 'অবনীবাবুর বই বেরোলে কে কোন্ কাগজে কতখানি রিভিউ করবে, রিভিউয়ে কোন্ কোন্ পয়েন্টের ওপর জোর দেবে—তাও ঠিক হয়ে গেছে।'

'যাই বলুন হেমন্তদা, অনাদিবাবু কিন্তু জেণ্টলম্যান নন। আমাদের শ দেড়েক দিলেই হয়ে যেত, কিন্তু বটুকের পাল্লায় যখন পড়েছে—'

ত্রিদিব বলে, 'অথচ বটুকের নিজের খরচেই বই বের করার কথা ছিল। আপনাদের নিউজ এডিটার বটুককে যখন ফোন করেন, আমি তখন ওর দোকানে ছিলাম। তিনি পরামর্শ দেন গবর্নমেণ্টকে ইনকাম ট্যাক্স দেওয়ার চেয়ে অবনীবাবুর কবিতার বই ছাপা ভালো। এবং এই বইটাকে একটা স্পেশাল কেস হিসেবে ধরতে হবে।'

'কিন্তু এতক্ষণ তো এসব কথা বলিসনি?'

'তোদের বলে লাভ! হেমন্তদা যদি এখন একটা উপায় বের করতে পারেন।'

'আমি!'

'আপনি তো স্বীকার করেন হেমন্তদা, অবনীবাবুর ওপর আমাদের একটা ক্লেম মানে দাবি আছে ?'

'ওঁর কবিতা পছন্দ না করলেও কবি হিসেবে ওঁর মর্যাদা শুধু 'কবি'-ই দিয়েছিল ?'

'একমাত্র 'কবি'-তেই ওঁর প্রতিটি বইয়ের বড় রিভিউ বার হয় ?'

'তাছাড়া এতদিন আপনিই ওঁর কবিতার ভাণ্ডারী ছিলেন। আর আজ আপনাকে বাদ দিয়েই অনাদিবাবু সব ব্যবস্থা করছেন—এটা কি ঠিক ?'

শক্তিদের প্রত্যাশাব্যাকুল মুখগুলির দিকে চেয়ে হেমন্ত অসহায় বোধ করে। তার ওপর ওদের এতখানি ভরসার কোন যুক্তি আছে ? অবনীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই কি ওদিকের সঙ্গে তার সমস্ত সম্পর্ক চুকে যায়নি ? অবনীর সম্পত্তির মত তার কবিতারও আধাআধি মালিক এখন অনাদি। হেমন্তর কিছু বলার কোন্ এক্তিয়ার ?

'কয়েকটা লেখক-পাবলিশারের সঙ্গে হুট করে আলাপ হয়ে যেতে অনাদিবাবু—'

'ধরাকে সরা জ্ঞান করছেন।'

'আপনাকে সাইডিংয়ে ফেলে দিচ্ছেন !'

'কিন্তু আপনি না থাকলে ওঁর ভাইকে আজ কে চিনত !'

'এটা কি অকৃতজ্ঞতা নয়, হেমন্তদা ?'

অকৃতজ্ঞতা ! হেমন্ত যেন সাপের ছোবল খায়। এখনও অবনী পুড়ে ছাই হয়নি, এখনও হেমন্ত শ্মশানে, আর এরই মধ্যে অনাদি অকৃতজ্ঞ হয়ে উঠল ?

অকৃতজ্ঞ হয়ে উঠল অবনী আর হেমন্তকে উপলক্ষ করে ?

'দেখি ! দেখছি ! দেখি আমি কী করতে পারি।'

হেমন্ত পালাতে পারলে বাঁচে।

শক্তিরা মিথ্যে বলেনি—শ্মশানে সত্যিই এক সাহিত্যিক সম্মিলন ঘটেছে : ইতস্তত চিতা আর লাশের মত সাহিত্যিকরা এখানে-ওখানে জোট বেঁধেছে, জটলা করছে। সাহিত্যিকদের সম্মিলিত হবার এই সুযোগ দিয়েছে অবনী।

অবনীর মৃত্যু। নইলে দুদণ্ড বসে আড্ডা দেওয়ার ফুর্সৎ কোথায় ওদের আজ। যতক্ষণ না কালঘাম ছোটে কলম দাবড়াও। বাকি সময়টা মাল-বেচার তদ্বির-তদারকিতে প্রডিউসার-প্রকাশক-সম্পাদকদের দরজায় ধর্না দাও।

ছোট সাহিত্যিক হলে ধর্না দাও, বড় সাহিত্যিক হলে বাড়িতে এনে তাদের আপ্যায়ন করো।

ইদানীং আবার প্রাইজের হুজুগ বেরিয়েছে: বইয়ের ঘন ঘন এডিশন হলেই শুধু চলবে না, যাত্রার নায়কের মত মেডেলের মালা গলায় ঝুলিয়ে আসরে নামতে হবে। এডিশনটা হাতের পাঁচ—টাইটেল পেজ ছাপায় বাড়তি খরচটা দিলেই এগারো শো কপিতে এগারোটা এডিশন করা চলে। দাদের মলমের মত বইটা বাজারে একবার চালু হয়ে গেলে অবশ্য আর জোচ্চুরির দরকার হয় না।

কিন্তু প্রাইজের জন্যে সিন্নি চড়াতে হয় নানান দরগায়। হিসেব করে চলতে হয়, ভেবেচিন্তে কথা বলতে হয়: কাজ প্রায় বাগিয়ে এনেছিল জলধর ঘোষ। প্রাইজ পেলে জলধর সম্বর্ধনার কী রকম ব্যবস্থা হবে, জলধর-প্রতিভা সম্পর্কে কে কে বক্তৃতা দেবে, প্রধান অতিথি হবে কোন্ কাগজের সম্পাদক আর কোন্ কাগজের সম্পাদক সভাপতিত্ব করবে, জলযোগের ব্যবস্থা কেমন হবে, সাকুল্যে জলধরের ব্যাটা কত খরচ করবে—সবই জলধর ঠিক করে ফেলেছিল। কিন্তু কী যে মতিচ্ছন্ন হল—পাল্লায় পড়ে শিক্ষক ধর্মঘট সম্পর্কে এক স্টেটমেণ্টে সই দিয়ে বসায় গেল সব ভেস্তে।

তা প্রাইজ ফস্কে যাওয়ায় জলধরের অবিশ্যি আজ আর আপসোস নেই। আজকের দুর্ধর্ষ বামপন্থী লেখক জলধর ঘোষ। একটা প্রাইজে আর কত পেত? জলধরের প্রত্যেকটি গল্প-উপন্যাস এখন ট্রিবল্ টোট মারে—বই, স্টেজ, সিনেমা।

অথচ রিয়্যাকশনারী বলে প্রাইজ-পাওয়া লেখকদের যে-দুর্নাম জলধরের তা নেই। পিছনে যে তার জনতার পার্টি। যদিও জলধরের গল্প-উপন্যাস মানেই ঘুমপাড়ানী কথা সাহিত্য—এক কথায় কাঁথাসাহিত্য, কিন্তু সভা-সমিতিতে তো পার্টি লাইন মেনে চলে।

আর কি চাই? লেখক হিসেবে তুমি কী লেখো সেটা পার্টির কাছে

বড় নয়, মানুষ হিসেবে তুমি কোন্ পক্ষে সেটাই বিবেচ্য। খদ্দের বুঝে সাজগোজ ঢংঢাঙের মত লেখো তুমি, কাগজ বুঝে গল্প-উপন্যাস, ক্ষতি নেই, পার্টিকে নিয়মিত চাঁদা দিয়ে যাও, পার্টির স্লোগানে গলা মিলিয়ে চলো—পার্টির স্নেহ অঝোরে ঝরতে থাকবে।

নেই-মামা পার্টির কানা-মামা ছাড়া গতিই বা কী!

: উপন্যাসের শুরু—ন বছরের একটি ছেলে ইশকুলে ভর্তি হচ্ছে, শেষ—পঁচিশ বছর বয়সে ইউনিভার্সিটির হীরের টুকরো সেই ছেলেই বইপত্র ফেলে নাম লেখাচ্ছে এক কুস্তির আখরায়—

: আইডিয়াটা চমৎকার।

: অর্থাৎ আমি বলতে চাই আজকের দিনে—

: আপনি! কলকাতায় কবে এলেন?

: কাল।

: ভালো আছেন? নতুন কী লিখছেন? অনেকদিন আপনার কোন বই বেরোয়নি—

: পেটটা এমন ট্রাবল দিচ্ছে! লেখা আপাতত—

: অনিরুদ্ধ ভটচাজের অপ্রকাশিত কবিতা? এখনও ফুরোয়নি?

: ফুরোলে চলে! যা ডিমাণ্ড!

: তা আজকাল ওর কবিতাগুলো কে লিখছে?

: ডেকে নিয়ে গিয়ে ফিশফিশ করে কী বলছিল রে?

: 'দেশ'-এ ওর যে গল্পটা বেরিয়েছে—

: পড়েছিস কিনা? ওটা এমন হ্যাংলা!

: ও কিন্তু ভুলেও কখনো কারও লেখা—

: অসম্ভব! পুজোর আগে কোনমতেই—

: আমি কিন্তু দাদা অনেক আশা করে—

: আমি তো গোড়া থেকেই বলছি, বই দেব ঠিকই কিন্তু কবে দিতে পারব—

: আমরা ছোট পাবলিশার—বোঝেনই তো দয়া করে—

: বললেন—এবার থেকে শুধু উপন্যাস লিখবেন।

: সেরেছে! একেকটা গল্পেরই যা সাইজ—

: বললেন, গল্প আর লিখব না। কারণ পুতুল গড়লে প্রতিমা গড়ার হাত নষ্ট হয়ে যায়।

: বাহবা! লাখ কথার এক কথা।

: আত্মহত্যাই বাহাদুরি।

: তোর মত পেসিমিস্ট—

: আত্মহত্যা করতে পারে শুধু মানুষ। জন্তু-জানোয়ারের সে-সাধ্য নেই, সেই হিসেবে—

: অথচ ও-ই আগে বলত একসারসাইজ করাটা বুর্জোয়া মনোবৃত্তি। কারণ ওতে শুধু ব্যক্তির উপকার হয়, সমাজের কোন—

: আর আমার কাছে সেদিন তোর নামে, পার্টির নামে এমন সব—

: পাবলিকেশনে নামছে?

: ওর ধারণা সব পাবলিশার ওকে ঠকায়।

: বারেন্দ্র বামুনকে ঠকাবে! ওর মত একটা ফোর-টুয়েন্টি লেখক—

: আসলে এ্যাদ্দিন পাবলিশার ঘায়েল করেছে, এবার প্রেস ও দপ্তরীকেও ঘায়েল করার মতলব।

: আমার শালীর সঙ্গে ট্র্যামে একদিন আলাপ করিয়ে দিয়েছিলাম। প্রেম করে বিয়ে করেছে শুনে পরদিনই তার বাসায় গিয়ে হাজির।

: চেনাদের নিয়ে গল্প লেখার সুবিধে আছে—জ্যান্ত নায়িকার সঙ্গে খানিকটা লদকা লদকি করা যায়।

: আমি বলছি—দেখিস—একদিন ও নির্ঘাত কোথাও ধোলাই খাবে। চেনা লোকদের নিয়ে গল্প লেখা তখন—

: আপনি! নমস্কার! নমস্কার! আপনার কত গল্প পড়েছি! চমৎকার হাত।

: আমি কবিতা লিখি।

: অ্যাঁ! অ্যাঁ! আচ্ছা! আচ্ছা!

: কী লিখলে নয়, কী পরিমাণ লিখলে সেইটেই আসল।

: আমি তা মনে করি না। লেখার গুণই আসল।

: আমি কিন্তু আপনার সঙ্গে একমত। কারণ যত বেশি লিখবে, তত বাজে লিখবে। যত বাজে লিখবে তত পপুলার হবে। যত পপুলার হবে তত বই কাটবে। এবং যত বেশি বই কাটবে তত বড় সাহিত্যিক হবে।

: এক লাখ?

: আশি ব্ল্যাকে, কুড়ি কাগজপত্রে!

: অথচ আর সবাই—

: ছিবড়ে পায়। কিন্তু উনি যে স্টার। বয়স অল্প, শরীরে মানানসই মাংস আছে—

: অভিনয়টা ভালোই করে—শক্তিমান অভিনেত্রী!

: শক্তিমান! শক্তিমান লেখক, শিল্পী, বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তারের অভাব নেই। কিন্তু কই, তাদের নিয়ে তো অত নাচানাচি হয় না?

: আসলে আমি যা বললাম—সেক্স অ্যাণ্ড পারভারশন! বেলেল্লাপনার এমন ঢালাও সুযোগ তো ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ারদের ব্যাপারে নেই। কোন ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ারের দেহকে কল্পনা করে কি রাত্তিরের শয্যাসুখ মেলে? তাই—

: অন্ধদের নিয়ে?

: পাবলিশারে চায়। আমিও দেখলাম নতুন বিষয়বস্তু না হলে আজকাল বই বিক্রি হয় না। তাই অনাথ আশ্রম নিয়ে যে উপন্যাসটা ফেঁদেছিলাম—তার সবকটা চরিত্রর চোখ গেলে দিয়েছি।

: ব্যস?

: এক-আধটু ঘষামাজা অবশ্য করতে হবে, সে প্রুফে ঠিক করে দেবখন।

: রবীন্দ্রনাথ আজীবন ব্রহ্মচারী ছিলেন?

: স্পষ্ট শুনলাম। আমি সভাপতি, উনি প্রধান অতিথি। অবস্থা বুঝে আমি নমো নমো করে দু কথায় সেরে ফেললাম, উনি শুরু করলেন গলা ফাটিয়ে মেঠো বক্তৃতা। তারপর উচ্ছ্বাসের তোড়ে—

: লোকে হুই হুই করে উঠল না?

: কংগ্রেসী নেতার মিটিংয়ে হল্লা? ভলান্টিয়াররা কমিউনিস্ট বলে লাঠি পেটা করত না?

: আগে রাজারা বাইজী পুষত, রাজাদের ফুর্তি জোগানোই ছিল তাদের কাজ। এখন গণতন্ত্রে জণগণকে ফুর্তি জোগানোই—

: রাশিয়ায় কিন্তু—

: সেখানেও লেখককে রাষ্ট্রের হাতে পুতুল-নাচ নাচতে হয়।

: এদেশের মত খেমটা তো নাচতে হয় না।

সন্ধ্যার অন্ধকারে চিতাগুলি বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে।

দেহ-মন জুড়িয়ে যাওয়া হাওয়া দিচ্ছে। গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর। স্নিগ্ধ এই সমীরে হেমন্তর শরীর শুধু জুড়িয়ে যায় নয়, একেবারে ঝিমিয়ে আসে। ইচ্ছে করে জামাকাপড় ছুঁড়ে ফেলে গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। মোষের মত ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাদা-জলে বুক দিয়ে পড়ে থাকে। দুনিয়ার দিকে পিছন দিয়ে।

কিন্তু মানুষের আন্তরিক কোন ইচ্ছাই তো বাস্তবে কার্যকরী করা সম্ভব

নয়। সভ্য জগতে সভ্য মানুষের আন্তরিক কোন ইচ্ছা। অগত্যা হেমন্ত সিগারেট ধরায়।

এখন চলে যাওয়া দরকার। এখন—এখনই। খানিক আগেও সিগারেটের ধোঁয়ায় পেট গুলিয়ে উঠছিল। মুখটা বিস্বাদ ও থুতু আঠা-আঠা লাগছিল। এখন এক বুক ধোঁয়া গিললেও কোন অনুভূতি আর জাগছে না। এই অনুভূতিহীনতা, চোখের জ্বালা-জ্বালা, শরীরের ম্যাজম্যাজানি—লক্ষণগুলি ভালো নয়। কিছু খেতে হলে আর দেরি করা ঠিক নয়। এর পর খেলে বমি সামলাতে পারবে না।

সবার থেকে আলাদা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল অনাদি। অবনীর চিতার দিকে পাশ ফিরে, দূরের দিকে চেয়ে।

চিতার আগুনে আধখানা মুখ তার কালচে-লাল। ঝকঝক করছে একটা চোখ। ভুরুর চুল খাড়া খাড়া।

'অনাদি-দা?'

অনাদি ফিরে তাকায়। মুখে যে পাথুরে কাঠিন্যটা ফুটে ছিল সঙ্গে সঙ্গে মুছে যায়। 'আচ্ছা মানুষ তো!' সারা মুখে অজস্র রেখা ফুটিয়ে অনুযোগ দেয়, 'সেই যে গেলে—'

'কাজেই গিয়েছিলাম অনাদিদা।' হেমন্ত এগিয়ে যায়, 'আমাদের কাগজের রিপোর্টার এসেছিল তাকে সব বুঝিয়ে-টুঝিয়ে দিলাম।'

'রিপোর্টার এসেছিল—শুনলাম বটে!' আহত স্বরে অনাদি বলে, 'কই আমার সঙ্গে তো দেখা করল না? সাহিত্যিকরা সকলেই কিন্তু—'

'আপনার সঙ্গে দেখা করতে ও-ও চেয়েছিল, আমিই বারণ করলাম। অত বড় রিপোর্ট লেখা, ভালোভাবে সেটা ছাপার ব্যবস্থা করা—বুঝলেন না?'

অনাদি কী বোঝে সে-ই জানে, 'তা বটে।' বলে মৃদু-মন্দ মাথা নাড়ে। তারপর হঠাৎ যেন কথাটা মনে পড়ে গেছে এই ভাবে জিজ্ঞেস করে, 'ইয়ে—ফটোগ্রাফার আসেনি?'

'আসার তো কথা ছিল।'

'সাহিত্যিকরা খোঁজ নিচ্ছিলেন। অনেক বড় বড় সাহিত্যিক এসেছে—আলাপ করলে?'

হেমন্ত সায় দেয়। ঠিক আলাপ না করলেও ওদের আলাপচারি শুনে এসেছে। প্রতিটি জটলার পাশ দিয়ে ঘুরে ঘুরে অনাদির কাছে এসেছে। প্রতিটি জটলার সামনে ক্ষণিকের জন্যে দাঁড়িয়েওছে, কথা বলতে চেয়েছে—কিন্তু নিজেদের কথাতেই ওরা এমনই জমজমাট যে বাধা দিতে মন চায়নি: আহা, অবনীর মরার জন্যে কর্পোরেশন ট্যাক্সো পেল, শ্মশানের ডোমরা কমিশন পেল—সাহিত্যিকরা প্রাণ খুলে দুটো কথা বলার সুযোগ পাবে না!

'সবাই এসে আমার সঙ্গে দেখা করলেন খুব সিমপ্যাথি জানালেন—আমি শুধু কাঁদলাম।'

সহানুভূতি কান্নাকে উস্কে দেয় হেমন্ত জানে, কিন্তু এই কান্নার কারণ যে তা নয় অনাদি সঙ্গে সঙ্গে সেটা জানিয়ে দেয়।

'কাউকে চিনি না। কে কত বড় সাহিত্যিক জানি না। কী ভাবে আদর অ্যাপায়ন করব, কাকে কী বলব—কী যে দুর্ঘটে পড়েছিলাম।'

সুতরাং কান্না! কাউকে না-চেনার, কিছু না-বলার, আদর-আপ্যায়ন না-করার হাত থেকে রেহাই পাবার চমৎকার মতলবটি তো বের করেছিল!

'আচ্ছা, ওঁদের জন্যে একটু চায়ের ব্যবস্থা—'

'কী বললেন?'

'এই চা আর দুটো করে বিস্কুট। তার বেশি তো এখানে—'

'ক্ষেপেছেন!'

'তবে থাক।' অনেকক্ষণের একটা মানসিক দ্বন্দ্ব যেন ঝেড়ে ফেলে তাজা গলায় অনাদি বলে, 'শ্রাদ্ধের দিন কিন্তু সব্বাইকে নেমন্তন্ন করতে হবে—হাঁ। দয়া করে ওঁরা যখন—'

'বেশ তো।'

'বেশ তো নয়, করতেই হবে। ছোটকা রাজী।' তারিফের ঢঙে মাথা দোলায় অনাদি। বোধ হয় শ্রাদ্ধের দিন সাহিত্যিক সমাগমে তার বাড়ির রূপের কী খোলতাই হবে—এখনই দেখতে পায়। কী ভাবে সে হাঁকডাক করে সাহিত্যিকদের আদর-আপ্যায়ন করবে—তাও।

'এই ভাখ! আসল কথাটাই তোমায় বলা হয়নি—ওই হতভাগার একটা কবিতার বই—'

'শুনেছি।'

'শুনেছ!' অনাদি দস্তুরমত দমে যায়। আসল কথাটা সে আগে বলতে পারল না বলেই বুঝি কাঠের গুঁড়িটার ওপর ধপ করে বসে পড়ে। এবং বেমক্কা বসে পড়ায় খোঁচা লাগলে 'উঃ!' করে উঠে কাৎ হয়ে পাছায় হাত বুলোয়।

হেমন্তর মায়া হয়: কেন 'শুনেছি' বলে লোকটার মনে দাগা দিল! অনাদি তো আর কথাশিল্পী নয়—হড়বড় করে বলে ফেলত। মিনিট খানেক সময় দিলে কী আর এমন হত!

দেবে নাকি ওর পাছায় একটু হাত বুলিয়ে?

'আমি তাহলে এখন চলি অনাদিদা।'

'আমাদের সঙ্গে ফিরবে না?'

'ভাবছি একবার অফিসে যাই।'

'একসঙ্গে ফিরতে হয় না? বাড়িতে গিয়ে আগুন ছোঁয়া—'

'আমি তো শ্মশানযাত্রী নই। তাছাড়া অফিসে একবার যাওয়াও দরকার। রিপোর্টটা যাতে কাল প্রথম পাতায় বেশ ফলাও করে ছাপা হয়—'

'প্রথম পাতায়? একেবারে ফ্রণ্ট পেজে?' অনাদি উঠে দাঁড়ায়। এগিয়ে এসে হেমন্তর কাঁধে হাত রাখে। 'তাহলে তুমি এসো ভাই। এসো এসো—আর দেরি করো না।'

হেমন্তর ভয় হয়, এখনি সে পিছন না ফিরলে হাতটা অনাদি কাঁধ থেকে সরিয়ে তার ঘাড়ে রাখবে, শ্মশান থেকে তাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবে। যেভাবে ঠেলছে!

শরীর শক্ত করে দাঁড়ায় হেমন্ত। যাবে না। কক্ষনো অফিসে যাবে না। হীরেনের রিপোর্টের জন্যে মনটা তার ভেতরে ভেতরে খচখচ করছিল: যে-কাগজ তাকে খাওয়ায়-পরায়, সেই কাগজে একটা ভুল রিপোর্ট বেরোবে, জেনেশুনেও সে মুখ বুজে থাকবে—শুধু অকৃতজ্ঞতা নয়, এ স্রেফ সাবোতাজ।

তাই ঠিক করেছিল একবার অফিসে যাবে। রিপোর্টটা ঠিক করে দিয়ে আসবে।

কিন্তু অনাদির কোন্ রাইট আছে তাকে অফিসে ঠেলে পাঠাবার? অনাদির কাছে তার কিসের বাধ্যবাধকতা?

'জানো ভাই হেমন্ত', কঁকিয়ে কঁকিয়ে অনাদি বলে, 'আজ দুটো জিনিস বুঝলাম—কাছে থেকে মানুষকে চেনা যায় না আর গুণ থাকলে মানুষের দোষ চাপা পড়ে যায়। স-ব দোষ চাপা পড়ে যায়। দোষ-গুণ মিলিয়ে মানুষ—কিন্তু—আমার কথা শুনে অবাক হচ্ছ, না?'

প্রৌঢ় দার্শনিকটির দিকে হেমন্ত চেয়ে থাকে ফ্যাল ফ্যাল করে। নবজাত প্রৌঢ় দার্শনিকটির দিকে।

'ওই হতভাগা যে এত বড় ছিল আগে যদি তা ঘুণাক্ষরেও—।' অনাদি দমকা শ্বাস ছাড়ে।

আগে তা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারলে কী হত? কী করত অনাদি? বউকে ভাইয়ের হাতে সঁপে দিয়ে লোটাকম্বল নিয়ে বেরিয়ে পড়ত?

'তুমি বুঝবে না ভাই, তুমি কেন কেউ বুঝবে না। আমার কথা—আমার দুঃখ—কেউ—কেউ—কেউই—'

ভেউ ভেউ করে অনাদি কেঁদে ওঠে।

অনিমেষ ভবতোষ তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসে। এগিয়ে আসে আরও কয়েকজন। সত্য এসে বাবাকে জড়িয়ে ধরে। ত্যাখ ত্যাখ করে ভিড় জমে যায়।

হেমন্ত পিছু হটে। পালায়।

এই নিয়ে কতবার হল—পালানো?

হীরেনের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছে। শক্তিদের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছে। অনাদির কাছ থেকেও পালিয়ে এল।

অনাদির বাড়ি থেকে পালিয়েছিল।

কনকের অফিস থেকে পালিয়েছিল।

আজ সারাটা দিন শুধু পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

কিন্তু নিজের কাছ থেকে?

কারণ যাই হোক আপসোসটা অনাদির মিথ্যে নয়।

অবশ্য অবনী থাকলে বলত—তোমার মনকে তুমি যদি না জানাতে পারো অস্তিত্ব নেই তোমার মনের। কেননা মানুষের জানার ওপরেই সবকিছুর অস্তিত্ব।

প্রীতির আব্দারে কবিতা ছাপাতে, প্রীতির গয়না-বেচা টাকায় কবিতার বই বের করতে অবনীকে রাজী করাবার জন্তে হেমন্তই একদিন এই থিয়োরী কপচেছিল। ঘোড়ার-আগে-গাড়ির থিয়োরীটা সে-ই ওর মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল।

ধাপ্পা দিয়েছিল? ক্ষতি কি? উপায় যেমনই হোক উদ্দেশ্য মহৎ ছিল: একজনের প্রেম, একজনের কৃতজ্ঞতা। সাধ-স্বপ্ন আরেকজনের!

অতএব কোন দোষ নেই ধাপ্পাবাজীতে।

ঘরের বাইরে তুমি বেরোতে পারছ না বলে বাইরের জগৎটা বিলকুল মায়া—এমন গাড়োলের মত বক্তব্যও, সুতরাং, মর্যাদা পায় দার্শনিকতার।

কিন্তু মন? হেমন্তর মন মানে না কেন?

ঘুরে-ফিরে হেমন্ত ফের অবনীর চিতার কাছে আসে।

যাবে? আরও কাছে যাবে? প্রাণের বন্ধুর পোড়া মুখখানা দেখলে মনে কি প্রতিক্রিয়া হয় পরখ করে দেখার জন্তে যাবে কি বারেক?

কিন্তু শ্মশানে হরিশ্চন্দ্রর পোজে যে-ভাবে লোকটা বাঁশ-হাতে ওৎ পেতে আছে ঘরে ফেরার তাগিদে তড়িঘড়ি কাজ হাসিলের জন্তে হঠাৎ যদি অবনীর খুলিতে বাড়ি হাঁকায় গরম ঘিলু ছিটকে এসে গায়ে লাগবে। ফলত মারাত্মক বিষাক্ত ঘা।

স্বামীহারা যে-স্ত্রীলোকটি অনেক কষ্টে ছেলেকে মানুষ করলেও জীবন ভর ছেলের জন্তে শুধু দুঃখই পেয়ে গেল তিলে তিলে তার পুড়ে মরাটা সইতে পারছিল না বলে হেমন্তই ধাঁ করে তার খুলিতে বাঁশের বাড়ি হাঁকিয়ে বসে।

মার গরম ঘিলু বুকে-গলায় যে ঘা তৈরি করেছিল পনের দিন তাতে শয্যাশায়ী হয়ে থাকতে হয়। স্বর্গাদপি গরিয়সী মার গরম ঘিলুর ঘা শুকোতেই পনের দিন আর এ তো বন্ধু!

বন্ধু! হেমন্ত দাঁতে দাঁতে শান্ দেয়।

হে বন্ধু, বিদায়! হেমন্ত চিবিয়ে চিবিয়ে বলে।

তোমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারি দান। চিতাটাকে হেমন্ত সেলাম ঠোকে।

গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত—

ঋণী!

দুই হাঁটু হেমন্তর থরথর করে ওঠে: ঋণী? ঋণী? এখনও ঋণী?

কোথায় তবে পালাবে হেমন্ত!

অন্ধকার। হেমন্তর মুখ চেয়েই বুঝি শ্মশানের আলো হঠাৎ ফিউজ হয়ে যায়। তেমন রোশনাইওলা চিতাও একটি নেই।

তবু জ্বলছে চিতাগুলি। ধিকি ধিকি হলেও জ্বলছে। জ্বলছে অবনীর চিতাও। ওই চিতার আগুন না নেভা পর্যন্ত শ্মশান থেকে যাবার সাধ্য নেই হেমন্তর।

—সব চিতাই এখন এক। আগন্তুকের মত চেয়ে ত্মাখ—অন্ধকারে সবই একাকার। ঝড়তি-পড়তি সাহিত্যিক, শ্মশানযাত্রী, শ্মশান-সন্ন্যাসী, ডোম-মুদ্দফরাস—সব্বাই।

পোড়ার প্রতীক্ষায় খাটিয়া-বন্দী লাশগুলি যদি এখন উঠে দাঁড়ায়—বেমালুম সাহিত্যিক শ্মশানযাত্রী সন্ন্যাসী ডোম মুদ্দফরাসদের সাথে গলাগলি হয়ে যাবে।

অন্ধকারের চেয়ে বড় সাম্যবাদী কে!

অন্ধকারের জীব হেমন্ত। আলোর উজ্জ্বল তার চোখ ধাঁধায়, চোখ বুজে সে স্বস্তি পায়। আলো-ছায়ায় হোঁচট খায়, অন্ধকারে অনায়াসে পা বাড়ায়।

অন্ধকারেই মানুষ চেনে।

মানিক বাঁড়ুয্যের দিনে এই লোকটাই না তাকে উদ্ধার করেছিল? এই যে দুটি পা দুটি হাত একটি মাথাওলা লোকটা। নইলে তার প্রস্তাব শোনা মাত্র ঠিক তারই মত এ চমকে উঠল কেন?

চমকে দুপা পিছিয়ে যায় লোকটা। চার পা এগিয়ে গিয়ে হেমন্ত তার হাত ধরে।

'রাম! রাম!' ভদ্রলোকের ছোঁয়ায় ডোমটা ছটফটিয়ে ওঠে।

সস্নেহে তার হাতে চাপ দেয় হেমন্ত।

'লেকিন —।' ডোম না, মুদ্দফরাস। মুদ্দফরাসের দ্বিধা তবু ঘোচে না।

'আপকো মেহেরবানী ভেইয়া!' পারে তো হেমন্ত মুদ্দফরাসকে বুকে জড়িয়ে ধরে।

'লেকিন হিঁয়া কাঁহা মিলবে বাবুজী!'

এইবার ধাতস্থ হয়ে আসে।

আসবেই। এমন গণ-সংযোগ—ম্যাস কনট্যাক্টের পর ধাতস্থ না হয়ে ওর উপায় আছে।

'হিঁয়া উও চিজ মিলনা বহুৎ মুশকিল বাবুজী।'

তা বললে কি চলে! মিলতেই হবে। যে করেই হোক। শুধু অন্ধকার এসেছে বলে নয়, দুই চোখ জ্বালা-জ্বালা করছে বলে নয়, অকথ্য অবসাদে সারা শরীর ভেঙে পড়তে চাইছে বলেও নয়—ভরাট ডাস্টবিনের মত এই মনটাকে শ্মশানের বাইরে বয়ে নিয়ে যাওয়া যে অসম্ভব হেমন্তর পক্ষে। আমার রয়েছে কর্ম। আমার রয়েছে বিশ্বলোক।

'হাম দুসরা আদমীকে ভেজে দিচ্ছে—।'

'হেমন্ত এক হাত দিয়ে শক্ত করে লোকটার হাত ধরে রাখে, আরেক হাতে পকেট হাতড়ে হাতড়ে পাঁচ টাকার একটা নোট বের করে।

'লেও। কৌসিস করো। মিলেগা জরুর।'

নোটটা হাতে গুঁজে দিয়ে পিঠে চাপড় মেরে ওকে ঠেলে দেয়। জয়যাত্রায় যাও হে!

পরিশিষ্ট

পায়ের কাছে ছলোছলো গঙ্গা। চারপাশে মাতাল হাওয়ার উতরোল। আকাশে আস্ত চাঁদ। পূর্ণ চাঁদের মায়ায় হৃদয়ের পথ ভোলা কিছু বিচিত্র নয়।

কনকের একখানা হাত হেমন্ত কোলে টেনে নেয়।

: আমি জানতাম তুমি আসবে!

: জানতে?

: জানতাম। কিন্তু আমার কি মনে হচ্ছে জানো? তুমি আসোনি, আমিই গিয়েছি তোমার কাছে। আমার প্রতীক্ষায় তুমি বসে ছিলে, দিন গুণে আর কাল গুণে আমি এলাম—মনে হল যেন পেরিয়ে এলাম অন্তবিহীন পথ!

: ছেলেমানুষ!

: সত্যিকারের মানুষ। জানো, আজ সারাদিন আমি কেবলই তোমাকে চেয়েছি।

: তাই তো আমি এলাম।

: রোজ তুমি কেন আসো না, কনক?

: রোজ তো আমায় তুমি চাও না।

: চাই না?

: না।

: না

: না! তোমার মনকে জিজ্ঞেস করো।

: মন! আমার কি মন আছে, কনক?

: মনটাই শুধু তোমার আছে।

মনটাই শুধু আমার আছে! হেমন্ত কনকের হাত ছেড়ে দেয়। মন তো

থাকে শুধু মানুষের। আমিও কি তবে মানুষ? একদিন আমি মানুষ ছিলাম, আজও আছি?

: কী হল?

: অক্ষম অপদার্থের কি মন থাকে কনক? আট বছর বিয়ে করেও যে স্ত্রীকে নিয়ে সংসার পাততে পারে না—

: সে তো আমার মুখ চেয়ে। হেমন্তর হাত এবার কনক কোলে তুলে নেয়। আমার ওপর অত বড় সংসারের দায়িত্ব, আমি চলে এলে—

: ওটা অজুহাত। ভালোবাসার মান রাখতে তুমি ওই অজুহাত সৃষ্টি করেছ।

: অজুহাত? না। তবু মানলাম তর্কের খাতিরে। কিন্তু ভালোবাসা থাকলে তার মান রাখতে হবে না?

: ভালোবাসা! আমি কি তোমায় ভালোবাসি কনক?

: নইলে আমায় চাও কেন?

: যদি বলি—

: মিথ্যে বলবে। এই তো আমার দেহ—কী দাম এর!

: যদি বলি—

: সংস্কার? স্ত্রী বলে ভালোবাসো? কিন্তু সংস্কারও তো মিথ্যে নয়। তুমি কি জানো না সংসারে যারা সুখ চায় শান্তি চায়—

: জানি জানি। জীবনের হাতে নিজেকে তারা শর্তহীন ভাবে সঁপে দেয়

: আমায় ভালোবাসো বলেই সুব্রতকে নিয়ে—

: সেও কি সংস্কার?

: নয়? তুমি কি জানো না মেয়েদের চাকরি করতে হলে শুধু রুটীন ওয়ার্ক করে গেলেই চলে না, উপরিও কিছু দিতে হয়? যে যত কম দিয়ে যত বেশি—

: জানি, কনক, জানি।

: কিন্তু একচক্ষু হরিণ তুমি। সবকিছুই একপেশে ভাবে দেখ। দেখ কেন না তাইতেই আনন্দ পাও।

: আনন্দ পাই?

: আনন্দর রূপ কি একটা ? ফুল দেখে কেউ আনন্দ পায়, নর্দমা ঘেঁটেও অনেকে আনন্দ পায়। নর্দমা ঘেঁটে আনন্দ পাওয়াটা রোগ।

: রোগ যেন—কিন্তু কারণটা অস্বাভাবিক হলেও রোগের জ্বালা যন্ত্রণা স্বাভাবিক।

: রোগ হলে মানুষ চিকিৎসা করায়।

চিকিৎসা করায় ? তারপর ? চিকিৎসা করালে রোগ ভালো হয়ে যায়। তারপর ? তোমার চারপাশে যদি রোগের বীজাণু ছড়ানো থাকে কত চিকিৎসা করাবে তুমি ? তোমার চারপাশে যদি নর্দমাই থাকে নর্দমা না ঘেঁটে উপায় কি তোমার ?

: চুপ করে গেলে কেন ? কথাটা পছন্দ হল না ? অবিশ্যি রোগ পুষে রেখে কেউ কেউ আনন্দ পায়।

কনক খোঁচা দিচ্ছে ! সেই পুরনো কথা। পুরনো খোঁচা। প্রতিবাদ করলে উত্তেজিত হয়ে উঠবে। টান্ টান্ হয়ে বসবে। আঁচল খসে পড়বে। স্তিমিত দুটি স্তনের মাঝখানে হারের লকেটটা বুকের ওঠা-নামায় ধুক ধুক করবে। কণ্ঠার হাড় ঠেলে উঠবে।

: তোমার অফিস থেকে চলে আসার সময় আমি কী ভেবেছিলাম জানো ?

: ইচ্ছেমত তুমি অনেক কিছুই ভাবো। যা ভাবতে ভালোবাসো তাই ভাবো।

: না, কনক। আমার বড় অভিমান হয়েছিল।

: অভিমান ! পোষমানা তোমার অভিমান। গরজ বুঝলেই ওকে কাজে লাগাও।

: কনক !

: ওই আধো আধো স্বরে ডেকে আর আমায় ভোলাতে পারবে না হেমন্ত। আমাকে তুমি আজ ঝেড়ে ফেলতে চাও, ঝোঁকের মাথায় একদিন যা করে ফেলেছ সেজন্যে আজ তোমার অনুতাপের অন্ত নেই। কিন্তু আমি তো তোমায় বেঁধে রাখিনি।

এ কি উল্টোপাল্টা কথা ! এই মাত্র আমার যে-কথার প্রতিবাদ করল

নিজেই এখন তা চেঁচিয়ে বলছে? আমাকে উসকে দিতে চায়? উসকে দিয়ে একটা হেস্তনেস্ত করতে চায়? আমি যেমন অবনীর সঙ্গে একটা হেস্তনেস্ত করার জন্যে মরিয়া হয়ে গিয়েছিলাম?

: কনক, আমি তোমায় ভালোবাসি।

: নিজেকে ছাড়া তুমি কাউকে ভালোবাসো না। তুমি একের নম্বর স্বার্থপর। সেয়ানা চোর যেমন অভাবের জ্বালায় চুরি করছি বলে মনকে বুঝ দেয়—

: কনক!

তুমি জানো সংসারে বাঁচতে হলে সংসারের নিয়ম মেনে চলতে হয়। তুমি নিজেও সেইভাবে বাঁচো। মুখ বুজে আঘাত সও, যেখানে প্রতিঘাতের ভয় নেই সেখানে পাণ্টা আঘাত দিয়ে বাহাদুরি দেখাও, কিন্তু—

কনক, এ আমাদের কেমন সম্পর্ক! এ আমাদের কেমন ভালোবাসা! যতক্ষণ দূরে দূরে থাকি পরস্পরকে কামনা করি, পরস্পরের জন্যে ব্যাকুল হই—কাছে এলেই ঠোকাঠুকি লাগে, আগুন জ্বলে। কনক, আমরা না স্বামী-স্ত্রী? আমরা না ভালোবেসে বিয়ে করেছি কনক?

: কনক! এসব কথা শোনাবার জন্যেই কি তুমি এলে? আর কোন কথা নেই? অন্য কোন কথা।

: প্রেমের কথা?

: ক্ষতি কি? এমন চমৎকার পরিবেশ। মনে পরে কনক—দক্ষিণেশ্বরের সেই বটগাছটির গোড়ায় একদিন—

: সেদিনের কথা?

: সেইদিনের কথা। হঠাৎ বৃষ্টি এল, আমি উঠে পড়ছিলাম, তুমি ধরে রাখলে—

: আমায় তুমি গান গাইতে বলেছিলে।

: হ্যাঁ। কিন্তু গল্পের নায়িকার মত তুমি গাইতে জানো না। আমিই তাই গলা ছেড়ে আবৃত্তি শুরু করেছিলাম—এসো নীপবনে ছায়াবীথি তলে—

: সঙ্গে সঙ্গে আমিও।

: তারপর আমরা স্বপ্ন দেখেছিলাম।

: স্বপ্ন দেখেছিলাম!

: অনেক স্বপ্ন !

: অনেক স্বপ্ন !

: অনেক অনেক অনেক স্বপ্ন।

স্বপ্ন ! স্বপ্ন ! স্বপ্ন !

: সেই স্বপ্নের কথা, আমাদের সেই স্বপ্নের কথা বলো কনক।

: কিন্তু যজ্ঞেশ্বরবাবুর কথাটা—

কী নিষ্ঠুর তুমি কনক ! কী নিষ্ঠুর ! কী নিষ্ঠুর ! কেন তুমি যজ্ঞেশ্বরের কথাটা এখন মনে করিয়ে দিলে !

তুমি কি জানো না—যজ্ঞেশ্বরের মাথা ঠিক হয়ে গেছে। জমানো টাকা-গুলি দিয়ে যজ্ঞেশ্বর একটা মনিহারী দোকান দিয়েছে। ভালই চলছে দোকান। দিব্যি আছে বুড়োবুড়ি।

কে বলবে, রিটায়ার করার দিন এই যজ্ঞেশ্বরই বলেছিল : হেমন্ত, জীবনে কারো কাছে কখনো হাত পাতিনি। কারো কাছে মাথা হেঁট করিনি। দু দুটি ছেলেকে হারিয়েও ভেঙে পড়িনি। বরং শহীদের বাপ আমি—সেই গর্বে বুক ফুলিয়েছি। দেশ স্বাধীন হলেও সাহায্যের জন্যে সরকারের দ্বারস্থ হইনি। ছেলের রক্তমাংস নিয়ে ব্যবসাদারি ! কিন্তু হেমন্ত—এখন আমার উপায় ! প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকাগুলি ফুরিয়ে গেলেও জীবনটা যদি না ফুরোয়—আমি কী করব হেমন্ত ? আমাদের দুজনের তখন কী গতি হবে হেমন্ত ! শহীদের বাপ আমি—আমায় কি তখন ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে পথে বেরোতে হবে ! বলতে বলতে যজ্ঞেশ্বর বুক চাপড়ে কেঁদে উঠেছিল।

দুশ্চিন্তাতেই যজ্ঞেশ্বরের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। খাওয়া দাওয়া সে বন্ধ করে দিয়েছিল। যদি টাকা ফুরিয়ে যায়। এর-ওর কাছে আফিঙের খোঁজ করত। টাকাগুলি ফুরোবার দিনই বুড়োবুড়ি একসাথে আফিঙ গিলবে বলে।

জীবিকার সংস্থান নেই অথচ জীবন আছে—ভবিষ্যতের সেই ভয়াবহ দিনের কথা ভেবে হেমন্তর বুকও হিম হয়ে এসেছে।

এমন ভবিষ্যতের ভরসায় সংসার পাতা সম্ভব ? প্রতি মুহূর্তে যদি যজ্ঞে-

শ্বরের কথা মনে পড়ে স্ত্রীকে বুকে টানতে পারবে? সন্তানদের কোলে নিতে পারবে?

: যজ্ঞেশ্বরবাবুর আশঙ্কাটা তো মিথ্যে নয় কনক। অন্ধের মত যদি বেঁচে থাকতে চাও, গড্ডলিকা প্রবাহে যদি ভেসে যেতে চাও আলাদা কথা, কিন্তু সুস্থ সুন্দর সার্থকভাবে বাঁচতে হলে ভবিষ্যৎ না ভেবে পারা যায়? যে-সমাজে সমর্থ যোয়ানদেরই বেঁচে থাকার কোন গ্যারান্টি নেই—

: খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার গ্যারান্টি? কিন্তু আগামীকালই অ্যাকসি-ডেন্টে মৃত্যু হতে পারে জেনেও তো মানুষ আজ বেঁচে থাকে? বেঁচে আছে! চিরকাল বেঁচে এসেছে? এই সমাজকে যারা ঢেলে সাজাতে চান সেই সব বড় বড় বিপ্লবীরাও তো—

: কিন্তু আমি কেন পারি না কনক?

: তাহলে জগৎ-সংসার সম্পর্কে তোমার মনগড়া ধারণাটা যে ধসে পড়ে।

: মনগড়া ধারণা? নিজের জীবন দিয়ে যে-অভিজ্ঞতা—

: অভিজ্ঞতা! কালো ছাড়া চোখে যার কিছুই পড়ে না—

: কিন্তু কালোটা পুরো না হোক অর্ধ সত্য তো বটে?

: অর্ধ সত্য? অর্ধ সত্যকে পুরো সত্যের মর্যাদা দেওয়া মিথ্যের চেয়েও ভয়ংকর। সুব্রতকে নিয়ে আমার সঙ্গে যে-ইতরামো করো সে ঐ অর্ধ সত্যেরই—

: কনক, তোমায় আমি আঘাত দিই, না? কেন দিই জানো? ভালো-বাসি বলে। কিন্তু তোমাকে যে-আঘাত দেই, জেনো সে-আঘাত দ্বিগুণ হয়ে আমারই বুকে—হাসছ?

: কথাগুলি কি বড্ড ন্যাকা ন্যাকা হয়ে যাচ্ছে না! নিছক ন্যাকামি।

: মনের কথা মুখ ফুটে বললে ন্যাকামিই শোনায়।

: নিজেকে ন্যাকা ভাবতে তোমার ঘেন্না হচ্ছে না!

: এখন হচ্ছে না। এ কথা শুধু তুমি শুনছ বলে হচ্ছে না। জানো কনক, নিজের কথা ভাবলে আমার সেই গেঁয়ো ছেলেটির কথা মনে হয়—কদিনের জন্যে শহরে এসে বারবার যে শুধু ঠকেই গেল। বাপ ঠাকুর্দার কাছ থেকে শোনা কথাগুলিই সে সত্য বলে ধরে নিয়েছিল, তাই শহর-

টাকে একটা হৃদয়হীন প্রতারক বলে জেনে গেল। অথচ এই শহরেরও একটা হৃদয় আছে, সেই গেঁয়ো ছেলেটির মনের সঙ্গে না মিললেও সেই হৃদয়েরও সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না প্রেম-ভালোবাসা সবই আছে। গেঁয়ো ছেলেটি তার নাগাল পেল না বলেই ভুল বুঝল। কিন্তু দ্বিতীয়বার শহরে এলে আর সে ভুল বুঝবে না। আর ঠকবে না। আমিও কনক—

: চুপ করলে কেন! কী তুমি!

: না, আমার উপমাটা ঠিক হয়নি। গেঁয়ো ছেলেটি দ্বিতীয়বার শহরে আসার সুযোগ পাবে—কিম্বা শহরকে ঘৃণা করে চিরকাল গ্রামকেই আঁকড়ে থাকতে পারবে। কিন্তু আমি? আমি তো আমার অতীতে ফিরে যেতে পারব না! আমার চল্লিশ বছরের জীবনটাকে নতুন করে শুরু করতে পারব না। ফেরারী আসামীর মত প্রাক্তনের স্মৃতি কেবলি মনে আমার হানা দেবে। দু নৌকোয় পা দিয়ে বাঁচা—অসম্ভব! অসম্ভব!

: হেমন্ত!

: কনক, আমরা যদি তিনটি জীবন পেতাম—একটি ভুল করবার জীবন, একটি জীবন ভুল শোধরাবার, আর একটি জীবন পরিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকার।

: হেমন্ত!

: কিম্বা আমি যদি আর সকলের মত হতাম কনক। নিজের সত্তাকে দুভাগে ভাগ করে ফেলতে পারতাম!

: হেমন্ত!

: কনক, আমি যদি অন্তত নাস্তিক না হতাম! আমি যদি জন্মান্তর মানতে পারতাম। সেও তো কম সান্ত্বনা নয়। জীবনে যার কোন অবলম্বন নেই-—

: তুমি কাঁদছ হেমন্ত!

: ইচ্ছে করছে! চিৎকার করে আমার কাঁদতে ইচ্ছে করছে। ভুল ভুল—সারাটা জীবন শুধু ভুলই করে গেলাম। কেন আমি জীবনকে যাচাই করতে চাই। কেন আমি জীবনের হাতে নিজেকে সঁপে দিতে পারি না। কনক, আমি ভেবেছিলাম অবনীর হাত থেকে রেহাই পেলেই মুক্তি আসবে।

কিন্তু কোথায় মুক্তি! যতদিন এই সমাজে বাস করব, এই সমাজের জলগ্রহণ করব—নেই—মুক্তি নেই।

: তবে বনে যাও। স্বাধীন হও।

: ঠাট্টা করছ!

: আমি এবার উঠি।

: যেয়ো না, কনক যেয়ো না। অনেকদিন পরে তোমায় কাছে পেয়েছি জানো, সেদিন নীহার বলে একটি মেয়ে—

: তোমার প্রলাপ শোনার মত ধৈর্য আমার নেই।

: বেশ, তবে অন্য কথা বলছি। তুমি বোসো। কী নিয়ে কথা বলা বলো তো! প্রীতির কথা শুনবে?

: জানি।

: আজ যা কাণ্ড করেছে না—

: আন্দাজ করতে পারি।

: তাহলে অনাদির কথা বলি। কীভাবে বারবার ও ভোল বদল করেছে

: স্বাভাবিক মানুষ যে।

: তাহলে যে-লেখকগুলো শ্মশানে এসে জুটেছিল—

: লেখকের পরিচয় তার লেখাতে।

: তাহলে আমাদের নিউজ এডিটার—

: পরের কেচ্ছা তোমার মুখে লেগেই আছে।

: তাহলে আমাদের কথা বলি। হ্যাঁ, তাই ভালো—তোমার কথা, আমার কথা।

: অতীতের কথা। অনেক বলা হয়েছে। বলে বলে দুজনেরই তা মুখস্থ মত হয়ে গেছে।

: তাহলে বর্তমানের কথা?

: বর্তমান! সে তো প্রতি মুহূর্তে অতীত হয়ে যাচ্ছে।

: ভবিষ্যৎ? হ্যাঁ, এসো কনক, আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়েই এখন আমরা কথা বলি—ছোট্ট একটি সংসার, দুটি সন্তান—একটি ছেলে একটি মেয়ে—নিকনো দাওয়া—তুলসী মঞ্চ—সন্ধ্যায় শাঁখ—সকালে গোবরছড়া—কনক!

: ছাড়ো।

: কনক!

: ছেড়ে দাও আমাকে। নষ্ট করার মত অঢেল সময় আমার নেই। ছাড়ো।

: কক্ষনো ছাড়ব না।

: জোর করবে?

: করব। দরকার হলে আলবৎ করব। আমার বিয়ে-করা বউকে আমি জোর করে—কনক!

প্রাণপণে কনক বলে হেমন্ত যাকে জড়িয়ে ধরে সেটা শ্মশানের কুকুর।

এতক্ষণ মাংসের ভাঁড়ে মুখ গুঁজে ছিল বলে হেমন্তর আদর-সোহাগ নির্বিবাদে সয়ে এসেছে। মাংস ফুরিয়ে যেতে এবার রুখে দাঁড়ায়। সরব প্রতিবাদ জানায়।

হেমন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। তাড়াতাড়ি সরে বসে।

কোল থেকে খালি বোতলটা গড়াতে গড়াতে গঙ্গায় গিয়ে ডুব দেয়।

এক পাঁইটেই বেহেড? খালি পেট বলে? না মালটা চোলাই ছিল বলে?

বেহেড বলে বেহেড! যদিও সেই চিরকেলে চাঁদটা এখনও তেমনি পরের ধনে পোদ্দারি করে অকাতরে জ্যোৎস্না ঢালছে এবং গঙ্গাও তার কর্তব্যমাফিক দুহাতে দখিনা সমীরণ ছড়াচ্ছে—কিন্তু ঐ চাঁদের আলোতেই না দিব্য ঠাওর হচ্ছে যে এটা শ্মশানের ঘাট?

দখিনা ওই সমীরণই না বয়ে আনছে মড়া-পোড়ার ঝাঁঝালো গন্ধ?

শ্মশানের ঘাটে বসে মড়া-পোড়ার গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে হেমন্ত কিনা কনকের সাথে পীরিত জমানোর জন্যে বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল?

ভাগ্যিশ ওটা কনক নয়, কুকুর।

সত্যি সত্যিই কনক হলে নীহারের মত তার কাছেও আর জন্মের মত মুখ দেখাতে পারত না।

নীহার পরের বউ। তার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ হলে কিছু যায় আসে ন
।কন্তু কনক যে বিয়ে-করা স্ত্রী। জন্ম জন্মান্তরের সম্বন্ধ যে ওর সাথে!

হেমন্ত উঠে দাঁড়ায়। পড়তে পড়তে টাল সামলায়।

মড়া পোড়ার গন্ধ!

অবনী অবশ্য অনেকক্ষণ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে—কিন্তু সব মড়া পোড়ার গন্ধই কি এক নয়?

রবীন্দ্রনাথ থেকে হেমন্তর মড়া পোড়ার গন্ধ অবধি?